সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 54 | No. 1 | 2016

Check for updates

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষা বিচার

Volume	54
Issue	1
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Saymon Zakaria
Published online	October 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v54i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i1.4
Pages	৫৭-৮৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষা বিচার

সাইমন জাকারিয়া*

সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য বিষয়-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। ঐতিহ্যবাহী নাট্যের এই বিষয়-বৈচিত্র্যের সাথে ভাষারীতির সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে, এই প্রবন্ধে মূলত নাট্যের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বাচনিক ও লিখিত রূপের গীত, বর্ণনা, সংলাপ ইত্যাদিতে প্রযুক্ত তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব শব্দের পাশাপাশি আরবি, ফারসি শব্দের প্রয়োগের কার্যকারণ নির্দেশসহ লোকভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের করণ-কারণ শনাক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য তথা 'লোকনাট্য'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে অধিকাংশ গবেষক বলেন: এ ধরনের নাট্যরীতি হল—১. লোকজীবনের কাহিনি-নির্ভর, ২. মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত, ৩. গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে আঞ্চলিকভাবে পরিবেশিত (আশুতোষ, ১৯৮২ :১২৯-১৩০) এবং ৪. এতে মূলত আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ ব্যবহার করা হয়।[১] (আশুতোষ, ১৯৮২ : ১৩০; মাধুরী ২০১৩ : ২১১) ক্ষেত্রবিশেষে একথাও উল্লেখ থাকে যে, 'লোকনাট্য' তথা ঐতিহ্যবাহী নাট্যের কোনো লিখিত পাণ্ডুলিপি হয় না।[২] (দুলাল, ২০১৩ : ২১২; মাধুরী ২০১৩ : ২১১) কিন্তু বাংলাদেশে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যের জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণে ভিন্নতর অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়; এই প্রবন্ধে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে প্রথমত বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য তথা 'লোকনাট্য' সম্পর্কে পূর্বে প্রচলিত মতগুলি খণ্ডন করা হচ্ছে, দ্বিতীয়ত জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণ থেকে সংগৃহীত মৌখিক ও লিখিত পাণ্ডুলিপি বা নাটলিপির ভাষার বৈশিষ্ট্য, শব্দ চয়ন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ইতিহাস, শ্রেণিবিন্যাস, বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্যের আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে—এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য [লোকনাট্য] সকল ক্ষেত্রে

*সহকারী পরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ এবং ভিজিটিং স্কলার, দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো, আমেরিকা।

লোকজীবনের কাহিনি-নির্ভর নয়, এমনকি তা কেবল মুখে মুখেও রচিত নয়, অনেক ক্ষেত্রে তার লিখিত পাণ্ডুলিপি লভ্য এবং তা অভিনয়ের সময় আসরে বা মঞ্চে দর্শক-শ্রোতাদের সামনে পালাকার বা প্রম্পটার [Prompter] কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।[৩] এছাড়া, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের আঞ্চলিকতার বিষয়টিও মাঝে মধ্যে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে; কেননা, এদেশের কিছু পরিবেশন শিল্পী-পালাকারের নিজস্ব এলাকা বা আঞ্চলিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে; বিশেষ করে যাত্রাগান, পুতুলনাচ ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী নাট্যকে আঞ্চলিক শিল্প হিসেবে বিচার করার কোনো সুযোগ নেই। এ ধরনের নাট্যশিল্পের শিল্পীরা পেশাগত কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে বিহার করেন এবং নানা স্থানে গিয়ে আঞ্চলিক শিল্পের আঞ্চলিক গণ্ডি ভেঙে তা বিভিন্ন এলাকায় পরিবেশন করেন। আসলে, আঞ্চলিক পরিবেশনশিল্প হিসেবে ঐতিহ্যবাহী নাট্যকে উল্লেখ করা হলেও এই শিল্পরীতি অনেক সময় ধর্ম-সাংস্কৃতিক কারণে একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা আঞ্চলিক সীমানা অতিক্রম করে এবং একই ভাষাভাষী অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রসঙ্গক্রমে বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* বা বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত* অবলম্বনে পরিবেশিত ঐতিহ্যবাহী নাট্য 'পদাবলি কীর্তন' বা 'লীলা কীর্তনে'র কথা বলা যায়। নাটোর-সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের মিহির ঘোষ, ফরিদপুর অঞ্চলের অমল ব্যানার্জী, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানার পাকুল্লার দুলাল চক্রবর্তী, নওগাঁর শ্রীমতী অনিতা রাণী দেবনাথ প্রমুখ কীর্তনীয়া তাঁদের পরিবেশনের আঞ্চলিক গণ্ডি অতিক্রম করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাধা-কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গলীলার বিভিন্ন আখ্যান-নাট্য 'পদাবলি' বা 'লীলাকীর্তন' শীর্ষক নাট্যাঙ্গিকে পরিবেশন করেন।[৪] এছাড়া, বাংলাদেশের অষ্টকগানের ঐতিহ্য দেশ-রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে ভারতের চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলার বিভিন্ন গ্রামে পরিবেশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ নির্দেশক-অভিনয়শিল্পী এখনও আসরগুলোতে প্রধানত বাংলাদেশের ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল অঞ্চলের পালাকারদের হস্তলিখিত নাটলিপি বা পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন।[৫] আবার পশ্চিমবঙ্গের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ঐতিহ্যনাট্যের শিল্পীদের কেউ কেউ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় নাট্য পরিবেশন করেন।[৬] (সাইমন, ২০০৮ : ১৩৫) ঐতিহ্যবাহী নাট্যের আঞ্চলিকতা অতিক্রমের দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী পরিবেশন 'নছিমন' নামের বিশেষ প্রকারের নাট্যরীতির কথাও উল্লেখ করা যায়। এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষণ বা জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় – এ ধরনের পরিবেশনের প্রচলন সুনির্দিষ্ট কোনো আঞ্চলিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তার বিস্তৃতি রয়েছে ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া থেকে শুরু করে পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, এমনকি দিনাজপুর, রংপুর পর্যন্ত। যথাযথ জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণের অভাবে অনেক গবেষক 'নছিমন' নাট্যাঙ্গিককে কোনো কোনো সুনির্দিষ্ট এলাকা, যেমন – কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ বা

সিরাজগঞ্জ ইত্যাদি এলাকার বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু, এর বিস্তৃতি যে এদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও রয়েছে তা অদ্যাবধি স্বীকৃত হয়নি। মোটকথা, ক্ষুদ্র আঞ্চলিক গণ্ডিকে অতিক্রম করে ঐতিহ্যবাহী নাট্য কখনো কখনো বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সম্পদে পরিণত হয়। এ রকম বহু দৃষ্টান্ত নিশ্চিতভাবে আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে, যার যথাযথ জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। উল্লেখ করতে দ্বিধা নেই, এ ধরনের গবেষণা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের বেশ কিছু ঐতিহ্যবাহী নাট্যাঙ্গিক ক্ষুদ্র অর্থে আঞ্চলিক পরিবেশনশিল্প হিসেবে বিবেচনা করে বৃহত্তর সমাজে গৃহীত ও প্রচলিত নাট্যঐতিহ্য হিসেবে প্রমাণ করা সম্ভব।

ভাষাতাত্ত্বিকের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় :

> ...ভাষার মূল উদ্দেশ্য মনোভাব জ্ঞাপন নয়, মনোভাব 'প্রকাশ' বা expression। ভাষাতাত্ত্বিকেরা ভাষার ভূমিকাগুলির মধ্যে কেবল মনোভাব-জ্ঞাপন (communication) এবং মনোভাব প্রকাশ (expression)-এর মধ্যে প্রকরণ ও বিষয়গত তফাত করেন। ভাষার 'প্রকাশ' কর্মে শুধু যে আবেগগত তীব্রতা আসে তাই নয়, এতে ভাষারও খানিকটা প্রমুখণ (foregrounding) ঘটে। অর্থাৎ ভাষা শুধু বিষয়ের বা বক্তব্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে না, সে নিজে নিজের দিকেও শ্রোতার খানিকটা মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে। (পবিত্র, ১৯৯৭ : ১২১)

ভাষার এই মনোযোগ আকর্ষণ প্রবণতাই এই প্রবন্ধ রচনার গভীরে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। কেননা, এদেশের বিভিন্ন প্রান্তে জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণে গেলে ঐতিহ্যবাহী নাট্যের আসরে নানা ধরনের ভাষা প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা যায়, কোথাও নিরেট আঞ্চলিক শব্দচয়নে বা স্থানীয় মানুষের কথ্য ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে নাট্য উপস্থাপিত হয়, কোথাও আবার সংস্কৃতবহুল শব্দচয়নে 'মান্য বা আদর্শভাষা' প্রয়োগে শিষ্ট বাংলায় নাট্য পরিবেশিত হয়।[৭] শুধু তাই নয়, এদেশের অনেক নাট্য পরিবেশনে সংস্কৃত মন্ত্র, প্রণাম, শ্লোক; আরবি-ফারসি শব্দ; এমনকি ইংরেজি শব্দ এবং বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী শব্দ ও ভাষা ব্যবহৃত হয়।

দুই

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষা-বিচারের ক্ষেত্রে উপস্থাপনরীতির দিক থেকে দুই ধরনের পাণ্ডুলিপিকে গ্রহণ করা হচ্ছে – ১. বাচনিক বা মৌখিকরীতির পাণ্ডুলিপি এবং ২. হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি।[৮] এছাড়া, বিষয়গত দিক থেকে ঐতিহ্যবাহী নাট্যের সনাতন, বৈষ্ণব, ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্ট ও অন্যান্য ধর্মীয় পরিবেশনের পাশাপাশি লোককাহিনি, রূপকথা-উপকথা বা সাধারণ লোকজীবনের পারিবারিক ও সামাজিক ঘটনানির্ভর নাট্যপালা, এমনকি সমতল ও পাহাড়ে বসবাসরত অবাঙালি বিচিত্র নৃগোষ্ঠী বা আদিবাসী সমাজে প্রচলিত নাট্যরীতিকে বিবেচনায় গৃহীত হয়েছে।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, ধর্মীয় হোক আর লোকজীবন হোক, অথবা হোক রূপকথা-উপকথার নাট্য পরিবেশন সবক্ষেত্রে হস্তলিখিত ও মৌখিকরীতির দুই ধরনের পরিবেশনের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন – *রামায়ণের* আখ্যান নির্ভর কাহিনি কখনো ভক্তিভাবে লিখিত হয়েছে, আবার কখনো ভক্তিরসে সম্পূর্ণ মৌখিকরীতিতে তথা বাচনিকশিল্প হিসেবে অলিখিতভাবে তাৎক্ষণিক অভিনয়ের মাধ্যমে লোকমানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় – কোনো কোনো অঞ্চলে *রামায়ণের* কাহিনি নিয়ে 'রামযাত্রা' বা 'ঢপযাত্রা'র নাট্যাঙ্গিকে পরিবেশনের জন্য 'লক্ষ্মণ-শক্তিশেল', 'রাম-সীতার বিবাহ', 'রাম-লক্ষ্মণ ও সীতার বনবাস', 'রামবিহীন অযোধ্যা' ইত্যাদি পালার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় এবং সে সকল লিখিত পাণ্ডুলিপিকে আশ্রয় করেই তা দর্শকের সামনে পরিবেশিত হয়; অন্যদিকে কোনো কোনো অঞ্চলে তা 'রামকীর্তন', 'রামমঙ্গল' ইত্যাদি নাট্যাঙ্গিককে মৌখিক রীতিতে আসরে পরিবেশিত হয়।

একথা ইসলাম ধর্মীয় নাট্যঐতিহ্যের ক্ষেত্রে সত্য, যেমন – কারবালার কাহিনি-নির্ভর পরিবেশনশিল্প 'জারিগান', 'জারিনাচ' ইত্যাদি মৌখিকরীতিতে আসরে উপস্থাপিত হয়; অন্যদিকে একই আখ্যান 'ইমামযাত্রা'র নাট্যাঙ্গিকে পরিবেশনের জন্য পাণ্ডুলিপি আকারে লিখিত হয় এবং মঞ্চে বা আসরে তা পরিবেশিত হয়ে থাকে।

বৈষ্ণবদের নাট্যঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত 'পদাবলি কীর্তন' বা 'লীলাকীর্তন' মূলত বাচনিকশিল্প বা মৌখিকরীতি পরিবেশনশিল্প; তবে, একই ধরনের পৌরাণিক কাহিনি-নির্ভরনাট্য 'কৃষ্ণলীলা', 'কৃষ্ণযাত্রা' ইত্যাদি পরিবেশনরীতি সাধারণত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিকে অনুসরণ করে।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় – বাচনিক বা মৌখিকরীতির হলেই বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের পরিবেশনে লোকভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয় না, আবার লিখিত হলেই তা শিষ্টভাষা বা সংস্কৃতবহুল শব্দের মিশ্রণে সর্বজনগ্রাহ্য মান্য [মার্জিত] ভাষায় বা সাধু ভাষায় পরিবেশিত হয় না। ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষায় আঞ্চলিক ও শিষ্ট বা মান্যভাষা প্রয়োগের মূলে লেখ্যরূপ বা মৌখিকরূপ কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করে না। আসলে, যে সকল ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়বস্তু বা আখ্যানবস্তুর একটি ধ্রুপদী বা সাহিত্যিকভিত্তি পূর্ব হতেই রয়েছে – সাধারণত সে সকল ঐতিহ্যবাহী নাট্যের পরিবেশনাতে সংস্কৃত শব্দবহুল সংলাপ-বাক্য-গীত চয়নে সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শভাষা বা শিষ্ট ভাষারীতি প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, এক্ষেত্রে মৌখিক বা লিখিত যে রীতিতেই তা পরিবেশিত হোক না কেন – প্রায় সকল পর্যায়ে শুদ্ধ ভাষারীতি প্রত্যক্ষ করা যায়। অন্যদিকে যে সকল ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়বস্তু সরাসরি গ্রামীণ মানুষের সমাজ-জীবন থেকে গৃহীত হয় – সে সকল পরিবেশনে অধিকাংশ সময় আঞ্চলিক বা স্থানীয় কথ্য ভাষারীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। আবার এও প্রত্যক্ষ

করা যায় — যে সকল আখ্যানবস্তু রূপকথা, লোককথা, উপকথা আশ্রিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে তার সঙ্গে যেমন সাহিত্যিকভিত্তি ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-সাংস্কৃতিক চিত্র প্রকাশিত হয় — সে ধরনের পরিবেশনে সর্বজনগ্রাহ্য শিষ্ট ও আঞ্চলিক — দুই ধরনের ভাষারীতির সমন্বিত প্রয়োগ বা মিশ্রভাষারীতি প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা যায়।

২.১ ধ্রুপদী আখ্যান-নাট্যের ভাষারীতি

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের পালাকার-শিল্পী-গায়ক কর্তৃক গ্রামের মানুষের সম্মুখে *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ইত্যাদি আখ্যানকাব্যের উপস্থাপনকে 'ধ্রুপদী আখ্যান-নাট্য' পরিবেশন হিসেবে শনাক্ত করা যায়। গ্রামের মানুষের কাছে এ ধরনের ধ্রুপদী আখ্যানের পরিবেশন নানা নামে ও নানা ভাবে সমাদৃত। *রামায়ণে*র কাহিনি-নির্ভর পরিবেশন কোথাও 'রামলীলা', কোথাও 'রামকীর্তন', 'রামমঙ্গল', 'রামযাত্রা' ইত্যাদি নাট্যাঙ্গিকে প্রচলিত। কৃত্তিবাসী *রামায়ণে*র কাহিনি আশ্রিত মৌখিকরীতির পরিবেশনশিল্প 'কুশানগান' ও 'রামলীলা' বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রাম-লালমনিরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এ ধরনের পরিবেশনরীতিতে সাধক-শিল্পীগণ কৃত্তিবাসী *রামায়ণে*র সমগ্র কাহিনি উপস্থাপন করতে সক্ষম।(সাইমন, ২০০৪ : ৪৭-৪৮)

ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষা বিচারের প্রয়োজনে লালমনিরহাটের আদিতমারী স্বর্ণমতি মন্দির প্রাঙ্গণে কৃপাসিন্ধু রায় সরকার কর্তৃক পরিবেশিত 'রামলীলা'র মৌখিকরীতির আসর থেকে শব্দযন্ত্রে ধারণকৃত 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' পালার শ্রুতিলিখনের প্রথমাংশের উদ্ধৃত ও বিশ্লেষণ করা যাক। এ ধরনের নাট্য পরিবেশনের শুরুতেই থাকে বন্দনা, তা হল :

নিজ গুণে কৃপা করে একবার এসো
এসো হে জগতের কাণ্ডারি
ধনীগণে পূজে তোমায় নানা উপাচারে
কি দিয়া পূজিব বল — আমি কি দিয়া
মন্ত্রহীন ভক্তিহীন জ্ঞানহীনও আমি
জ্ঞানহীনও আমি হে
ওই নাম পতিত পাবন
নিজ গুণে হৃদয়ে মাঝে
এসে তুমি হও অধিষ্ঠান॥

অখণ্ড মণ্ডলা কারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম।
তদপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।

চক্ষুরুন্মিলিত যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ॥
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর।
গুরু রেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ॥

হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপথে।
গোপেশ গোপীকা কান্ত রাধা কান্ত নমহস্তুতে॥
ওঁ ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রহ্মণ্য হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় বাসুদেবায় নমো নমঃ॥[৯]

উপর্যুক্ত বন্দনাংশের প্রথম স্তবকে তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের আধিক্য প্রত্যক্ষ করা যায়; যেমন– 'নিজ গুণে', 'কৃপা করে', 'জগতের কাণ্ডারি', 'উপাচার', 'পূজিব', 'মন্ত্রহীন', 'ভক্তিহীন', 'জ্ঞানহীন', 'পতিত পাবন', 'হৃদয় মাঝে', 'অধিষ্ঠান' ইত্যাদি শব্দের অধিকাংশই তৎসম তথা সংস্কৃত এবং তদ্ভব। উল্লেখ্য, স্থানীয় গায়কগণ এ সকল শব্দ উচ্চারণে কখনো কখনো আঞ্চলিক ভঙ্গি প্রয়োগ করেন, যেমন – 'উপচার' শব্দটি গায়কের আঞ্চলিক উচ্চারণ ভঙ্গিতে 'উপাচার' হয়ে ওঠে।[১০] তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রভাবিত ভাষার গাম্ভীর্য গায়কের উচ্চারণে রক্ষিত হয়ে থাকে। যে কারণে দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে গায়কের প্রতি উচ্চ ধারণা তৈরি হয়, সে ধারণা আরও অধিক প্রতিষ্ঠা পায় গায়কের পরবর্তী কার্যক্রমে।

আসলে, ধ্রুপদী আখ্যানের গায়কগণ প্রথম স্তবকের তৎসম ও তদ্ভব শব্দের মিশ্রণে 'জগতের কাণ্ডারি' তথা স্রষ্টাকে আসরে আহ্বানের পর দ্বিতীয় স্তবকে পরিবেশনের শাস্ত্রীয় কাঠামো যুক্ত করেন সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন প্রণাম-মন্ত্র বা শ্লোক উচ্চারণে, যা উপর্যুক্ত 'রামলীলা'র আসরের উদ্ধৃতিতে প্রত্যক্ষ করা যায়। আসরে বন্দনাংশে গায়ক যথাক্রমে সংস্কৃতভাষায় 'গুরু প্রণাম' ও 'শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম' করে শাস্ত্রীয় একটা ভাবের সঞ্চার করেন।

প্রশ্ন আসতে পারে–

১. গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশিত নাট্যগীতে এ ধরনের শিষ্টভাষা ও সংস্কৃত প্রণাম মন্ত্র বা শ্লোকের সুরেলা সংগীত-কথা উপস্থাপনের কারণ কী?

২. গ্রামীণ জীবনে যেখানে এখন আর কোনো সংস্কৃতশিক্ষা চর্চা তেমনভাবে নেই, সেখানে গায়ক এ ধরনের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান কীভাবেই বা পেলেন? দর্শক-শ্রোতাগণইবা কীভাবে এই সংস্কৃতভাষার ভাবসঞ্চারের সাথে নিজেকে একাত্ম করতে সক্ষম হন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে, নাট্য পরিবেশনের উপলক্ষ্য ও আসরে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা সম্পর্কে কিছু কথা উল্লেখ করতে হয়। প্রথমত বলতে হয় যে, গায়ক কৃপাসিন্ধু রায়

সরকার কর্তৃক সংস্কৃত প্রণাম বাক্য বা শ্লোক এবং তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের সংযোগে গীত উপস্থাপনের প্রধান কারণের সাথে উপলক্ষ্যের বিষয়টিই প্রধানভাবে যুক্ত। আসলে, শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে 'রামলীলা'র পরিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, আসরের অধিকাংশ দর্শক-শ্রোতা ছিলেন সনাতনধর্মীয় লৌকিক বিশ্বাসী মানুষ; তাই পুরো আসর জুড়ে শাস্ত্রীয় ভক্তির স্ফূরণ ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল। গায়ক মূলত সে বিষয়টি বিবেচনা নিয়েই তৎসম ও তদ্ভব শব্দের মিশ্রণে বাংলা ভাষায় গীত উপস্থাপনের পাশাপাশি সংস্কৃত প্রণাম-মন্ত্র বা শ্লোকের উচ্চারণে মাধ্যমে শ্রোতা-দর্শকের ভেতর শাস্ত্রীয় ভক্তিরস ও শাস্ত্রীয় দেবতা শিবের প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, *রামায়ণের* আখ্যান অবলম্বনে পরিবেশিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতি 'রামলীলা'র পরিবেশনের একটি শাস্ত্রীয় বিধান বা মার্গীয় ভিত্তি বাংলাদেশের সর্বত্রই সুদূর অতীত থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বহমান, তাই গায়ক খুব সহজেই গুরু-শিষ্য পরম্পরার উত্তরাধিকার ও বাচনিক বা মৌখিকরীতির ঐতিহ্যিক চর্চাকারী হিসেবে এ ধরনের ভাষারীতি প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। এ সম্পর্কে চমৎকার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় পবিত্র সরকারের *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি* শীর্ষক গ্রন্থে, যথা :

> ভাষাবিজ্ঞান যুক্তিবদ্ধ–তা পর্যবেক্ষণ, প্রমাণ, সাধারণীকরণ, আবার যাচাই ইত্যাদি গবেষণা ও বিচারজাত সিদ্ধান্তের সমষ্টি। কিন্তু লৌকিক ভাষাতত্ত্ব মূলত অনেক লোকের মনগড়া ধারণার সমষ্টি–সে ধারণা তারা কোনো একটা সাধারণীকরণ থেকে উপার্জন করেছে, কিন্তু যুক্তিতথ্য দিয়ে বারবার যাচাই করবার প্রয়োজন বোধ করেনি। এই বিশ্বাস বিনা সংশয়ে বিনা প্রশ্নে গৃহীত, উত্তরাধিকার বা অন্যের আরোপিত আপ্তবাক্য হিসেবে পাওয়া। অর্থাৎ অন্য যে কোনো সংস্কার বা বিশ্বাসের মতোই। (পবিত্র, ১৯৯০ : ১৫০)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির ইশারা থেকে একথা স্পষ্টত বলা চলে যে, ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে অতীতের কোনো 'সাধারণীকরণ থেকে উপার্জন'কৃত এবং সেই ভাষাগত ঐতিহ্য নাট্যের আসরে 'উত্তরাধিকার' সূত্রে চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে 'উত্তরাধিকার'সূত্রে প্রাপ্ত 'রামলীলা'র ভাষার শিষ্ট ঐতিহ্য গায়ক ও দর্শক-শ্রোতার অভিজ্ঞতার সাথে সমমাত্রায় গ্রথিত রয়েছে বলে তার সংস্কৃত, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের মিশ্রণ অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং আসর জুড়ে শাস্ত্রীয় ভাবসঞ্চারে সহায়ক হয়।

'রামলীলা' পরিবেশনের বন্দনাংশ এবং গুরু প্রণাম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম শেষ হলে গায়ক সাধারণত সুর-বাণীর গীতল ভঙ্গি থামিয়ে গদ্য-কথনের সূচনা করেন।

এ পর্যায়ে আসরে গায়ক কৃপাসিন্ধু রায় সরকার বলেন :

নামামৃত কাণ্ডারি। আদ্যাশক্তির অংশভুতা জগৎজননী মা-ভগ্নিগণ, আমার প্রাণাধিক ভক্তমণ্ডলী, আপনাদের সবার শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণতি। আপনারা এই লালমনিরহাট ডিস্টিকের মধ্যে এই আদিতমারী বিশেষ করে ভাদা ইউনিয়ন আমাকে এতো বেশি ভালোবাসেন যে ভালোবাসা বাংলা ৮০ সাল থেকে আজ ১৪১৩ সাল গত হয়ে যাচ্ছে দীর্ঘদিন আপনাদের ভালোবাসা আপনাদের স্নেহ আপনাদের আশীর্বাদ পেয়ে আজ আমি কৃপাসিন্ধু। নইলে কৃপাসিন্ধু হিসেবে আরেকটি নাম – আমি কিন্তু কোথাও খুঁজে পাইনি। আমার মিত্র করার মতো কাউকে এতোদিনে আমি খুঁজে পাইনি। এই কৃপাসিন্ধু নাম আপনাদেরই দেওয়া। বাংলা ৮০ সালে আমি এসেছিলাম সর্বপ্রথম আপনাদের এই ভাদা ইউনিয়নে। আজ এতোদিন আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করে আপনাদের কৃপায় আপনাদের দয়ায় আজ আমি কৃপার থেকে সিন্ধু হয়েছি। আমাকে কিন্তু আগে কৃপাসিন্ধু বলে কেউ ডাকতো না। মা ডাকতো কৃপা করে, বাবা ডাকতো কৃপা করে, আর গ্রামবাসীরা সবাই ডাকতো কৃপা করে, কেউবা কিরপা করে। কৃপাসিন্ধু আমি হয়েছি – এই লালমনিরহাট ডিস্টিকের বিশেষ করে ভাদা ইউনিয়নের ভক্তবৃন্দের কৃপা বলে। আপনাদের আশীর্বাদে দীর্ঘদিন আমার এই কীর্তনের বয়সে আপনাদের এই ভালোবাসা রাখার মতো ভাণ্ড আমার নেই। আজ নতুন করে আপনাদের আমি কী শুনাবো। এতোদিন যা শুনিয়ে গেছি আজও তাই শুনাবো। এই রামায়ণের কিছু কথা ছাড়া আর অন্য শাস্ত্র আমার পড়ারও সৌভাগ্য হয়নি, অন্য শাস্ত্রের প্রতি আমার প্রেমও নেই।

যখন আমি ছোট ছিলাম মায়ের কোলে শুনেছিলাম এই রামায়ণ গান – তোমার ঘণ্টা বাজার সাধ নইলে। এই ঘণ্টা বাজার সাধ নইলে – আমি মায়ের কোলেই শিখেছি। মায়ের কোল থেকে আজ আমি দীর্ঘদিন যাবৎ এই রামায়ণের ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছি। জানি না, কবে আমার এই ঘণ্টা বাজা শেষ হয়ে যাবে।

সম্মানিত ভক্তমণ্ডলী, প্রাণাধিক মাতৃভক্তগণ আজকে আমি যে পালাটি গাইবো – লঙ্কাকাণ্ডে প্রভু রামচন্দ্র রাবণকে বধ করার পর জানকী সীতাকে উদ্ধার করে লবণ সমুদ্র তীরে নিয়ে এলেন এবং তাকে অগ্নিপরীক্ষা করা হল। তারপরে প্রভু রামচন্দ্র যখন সমুদ্র বন্ধন করেছিলেন শিবের সঙ্গে তিনি একটা প্রতিশ্রুতি করেছিলেন – 'হে দেবাদিদেব মহাদেব, এই সমুদ্র বন্ধন করে যদি আমি আমার জগৎলক্ষ্মী সীতা উদ্ধার করতে পারি, অযোধ্যা ফেরার পূর্বে লবণ সমুদ্র তীরে আমি তোমায় নিজ হাতে পুজো করে তারপর অযোধ্যায় যাবো। আজ শিব চতুর্দশী রাত্রিতে প্রভু রামচন্দ্র শিব পূজা করেন লঙ্কার সমুদ্র তীরে, আজকের গান এই কাণ্ডটা নিয়ে। (সাইমন, ২০০৪ : ৪৮)

এই গদ্য-কথনে তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়, যেমন– 'নামামৃত কাণ্ডারি', 'আদ্যাশক্তি', 'অংশভুতা', 'জগৎজননী', 'মা-ভগ্নিগণ' 'প্রাণাধিক

ভক্তমণ্ডলী', 'শ্রীচরণ', 'প্রণতি', 'আশীর্বাদ', 'শাস্ত্র', 'জগৎলক্ষ্মী', 'চতুর্দশী রাত্রি' ইত্যাদি। এ ধরনের শিষ্ট শব্দ চয়নের মধ্যে গায়ক এক পর্যায়ে বেশ অনায়াসে 'ইংরেজি শব্দের মৌখিক রূপান্তরে' জেলার পরিবর্তে ডিস্টিক (district) শব্দটি প্রয়োগ করেন, যা মুহূর্তের ভাষার মধ্যে সমকালিক ব্যঞ্জনা টেনে আনে। কেননা, বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে সমকালে এ ধরনের বহু ইংরেজি শব্দের ব্যবহার চলছে।

উল্লেখ্য, 'রামলীলা'র এই উপস্থাপনটি কৃপাসিন্ধু রায় সরকার যদিও পরিবেশন করছেন – লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার একেবারে নিখাদ গ্রামীণ আসরে, সাধারণ একটি মন্দির প্রাঙ্গণে এবং যে অঞ্চলের একটি বলিষ্ঠ লোকভাষাও রয়েছে। কিন্তু গায়ক কৃপাসিন্ধু তাঁর কথার মধ্যে পরিপূর্ণ তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের প্রয়োগে অনেকটাই মান্যভাষায় কথা বলেন, ক্ষেত্রবিশেষে সংস্কৃত প্রণাম-মন্ত্র, শ্লোক ইত্যাদি প্রয়োগ করেন। এর মূল কারণ, *রামায়ণ*-কাহিনির প্রতি গায়কের স্বাভাবিক এক ধরনের শাস্ত্রীয় ভক্তিরসের প্রাবল্য। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের *রামায়ণের* আখ্যান পরিবেশনের প্রায় সর্বত্র এ ধরনের শাস্ত্রীয় ভক্তিরসের আধিক্য প্রত্যক্ষ করা যায়। এ পর্যায়ে অন্য অঞ্চলের বাচনিক বা মৌখিক রীতির *রামায়ণ* পরিবেশনে একই ব্যাপার ঘটে কি-না, তা যাচাই করে দেখা যাক।

বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায় কৃত্তিবাসী *রামায়ণের* আদর্শ অনুসরণে 'রামকীর্তন' বা 'রামমঙ্গলে'র পরিবেশন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন পূজা-পার্বণে তো বটেই, এমনকি শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে বা বিভিন্ন মানতে 'রামকীর্তনে'র বিভিন্ন পালা পরিবেশিত হয়ে থাকে। এবারে ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষা বিচারের নিমিত্তে কুষ্টিয়া জেলার রামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাই পরিবেশিত রামকীর্তনের 'অশ্বমেধযজ্ঞ পালা'র অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

এই পালার শুরুতে সম্মিলিত বাদ্যবাদনের পর গায়েনের ভূমিকায় রামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাই হারমোনিয়ামটি নিজের কাছে টেনে নিয়ে ভরাট কণ্ঠে রাগ সাধতে থাকেন– 'মা আ আ আ।' 'মা' ধ্বনির রাগচর্চার মধ্যে তিনি এক সময় বাংলা ও সংস্কৃত কথা আরোপ করেন :

ওম গুরুদেব মহেশ্বর।
অখণ্ড মণ্ডলা কারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম।
তদপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিত যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ॥
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর।
গুরু রেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ॥

বন্দে বন্দে আসরে যত ভক্তবৃন্দ
বন্দে সর্বজন

হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম।
রাম রাম রাম হরে হরে॥

ওরে এসো রাম-সীতা
তুমি দয়া করে এসো হে রাম॥
ও রাম, তোমার ভজনও না জানি।
তুমি পার করো নিজ গুণে।
ও রাম, তুমি একবার এসো হে॥
তোমার ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লয়ে
ডাকি যে তোমার
আমি ভজন না জানি॥ (সাইমন, ২০০৪ : ৪৭-৪৮)

এখানে বন্দনার পূর্বেই গায়ক সংস্কৃতভাষায় গুরু প্রণাম প্রয়োগ করেছেন। সংস্কৃতে গুরু প্রণামের ঠিক পর পরই মূলত বন্দনাগীত শুরু করেন। এক্ষেত্রে বন্দনায় গায়ক তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের বহুল প্রয়োগে শ্রীরামচন্দ্রকে শরণ করেছেন এবং নিজের দীনতা স্বীকার করে আসরের সাফল্যের জন্য স্বয়ং রামচন্দ্রকে আহ্বান করেছেন। আর এই আহ্বানগীতের সুর-বাণীর মধ্যে গায়ক তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের মধ্যে 'ভক্তবৃন্দ', 'সর্বজন', 'নিজ গুণ', 'সঙ্গ', 'ভজন' ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে গানের ভাষায় শিষ্টরূপ নির্মাণ করেছেন।

তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের প্রয়োগে সমাপ্ত বন্দনা গীতের পর গায়ক সাধারণত রামায়ণের নির্ধারিত আখ্যান বর্ণনার অবতারণা করেন। কুষ্টিয়ার রামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাই আখ্যান বর্ণনা শুরু করেন এভাবে :

প্রভু রামচন্দ্রের পিতা অযোধ্যার ভূপতি একের পর এক করতে করতে নয় হাজার বৎসর রাজত্ব করে ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেছেন। এখন তার পুত্র শ্রীরামচন্দ্র এগারো হাজার বৎসর রাজত্ব করিবেন। দশ হাজার বৎসর গত হয়ে গেছে, আর একটি হাজার বৎসর আয়ু। মৃত্যুচিন্তা তাঁর স্মরণ হয়েছে।

: সামান্য একটি হাজার বৎসর আয়ু আমার!

তাই অযোধ্যাতে শ্রীরামচন্দ্র আজকে প্রাতঃকালে-রজনীপ্রভাতে।

প্রাতঃকালে-রজনীপ্রভাতে অযোধ্যার ভূপতি শ্রীরামচন্দ্র ভেসে যান নয়নের জলে॥ আজ অনুজ লক্ষ্মণ ছলছল নেত্রে গদগদ ভাবে রামচরণে প্রণাম করে বললেন–দাদা...। (সাইমন, ২০০৪ : ৫২)

এখানে গায়কের ভাষার মধ্যে এক ধরনের গীতিময়তা প্রত্যক্ষ করা যায়। 'প্রাতঃকালে-রজনীপ্রভাতে'র সমার্থক যুগ্মশব্দ প্রয়োগে গায়ক গীতলতাকে সম্প্রসারিত

করেন; শুধু তাই নয়, বাক্যের মধ্যে একই শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে ধ্বনিমাধুর্য যেমন বেড়ে যায়, তেমনি গায়কের ভাষার মধ্যে ধ্রুপদীকাব্যের মতো অনাবিল এক ভাব সঞ্চারিত হয়, যা দর্শক-শ্রোতাদের মোহিত করে। গায়কের উপস্থাপনে এক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার তেমন কোনো প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা যায় না। উল্লেখ্য, কুষ্টিয়া অঞ্চলের ভাষার মধ্যে আপনা হতেই তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব শব্দ প্রয়োগে চর্চিত শিষ্টভাষার একটা রূপ আছে–একথা সত্য; তবে তারও একটি আঞ্চলিক রূপ আছে – কেননা, কুষ্টিয়া অঞ্চলে সাধারণত মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় অনেকক্ষেত্রে স্বল্পপ্রাণের রূপ গ্রহণ করে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় – কুষ্টিয়া অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষের উচ্চারণে 'খ'-এর পরিবর্তে 'ক', 'ছ'-এর পরিবর্তে 'চ' ব্যবহৃত হয়; কিন্তু গায়ক রামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাইয়ের 'রামকীর্তনে'র উপস্থাপনে কোথাও সে ধরনের কোনো ধ্বনি বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করা যায় না।

উত্তরবঙ্গের কৃপাসিন্ধু রায় সরকারের 'রামলীলা'র মতো কুষ্টিয়ার রামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাইয়ের পরিবেশনাও একক অভিনয়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়। শুধু কিছু দোহার-বাদ্যকর তাঁদের পরিবেশনে সংগীতাংশে সহযোগিতা দিয়ে থাকেন। যেমন – রামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাই যখন আখ্যান বর্ণনার মধ্যে সংগীত সূচনা করেন তখন দোহার-বাদ্যকরগণ তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ ও বাদ্যযন্ত্র সঙ্গত করেন। উপর্যুক্ত গদ্য ভাষ্যের পরই আসে সংগীত, যাকে লক্ষ্মণের গীত-সংলাপ হিসেবে শনাক্ত করা যায় :

ও দাদা, তুমি অমন করে কেঁদো না, কেঁদো না
আরে কাঁদা বদন তোমার দেখতে নারি॥
আরে তুমি কাঁদিলে আমার চোখে আসে বারি।
কাঁদা বদন তোমার দেখতে নারি।
আরে বলো কিসের এত তোমার অভাব হল গুণমণি
কাঁদা বদন তোমার দেখতে নারি।
বলো কিসের অভাব হল – খুলে বল, প্রাণ খুলে
আমি ধৈর্য ধরিতে নারি।
কাঁদা বদন দেখতে নারি।
ওরে প্রাণ খুলে বলো, আমার সম্মুখে বলো
কাঁদা বদন দেখতে নারি।
দাদা, তুমি কাঁদিলে এই জগৎ কাঁদিবে
কাঁদা বদন দেখতে নারি। (সাইমন, ২০০৪ : ৫২)

এখানে 'কেঁদো না', 'কাঁদা বদন', 'তুমি কাঁদিলে', 'জগৎ কাঁদিবে' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে ভাষার ভেতর ক্রন্দনের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়, সেই সাথে 'নারি', 'বারি',

'গুণমণি', 'প্রাণ', 'সম্মুখে' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগে এই বন্দনাগীতের আবহে পৌরাণিক কাব্য বয়ানের স্বভাব ধৃত হয়।

এ ধরনের বন্দনাগীতের পর গায়ক রামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাই সুর-বাণীর ভেতর থেকে বর্ণনাত্মক গদ্যে প্রবেশ করেন এবং বলেন – "আজ শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে জড়িয়ে ধরে বললেন।" এরপর কণ্ঠের পরিবর্তনে অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে তিনি রামচন্দ্রের সংলাপ উচ্চারণ করেন, রামচন্দ্রের জবানিতে বলেন :

> ওরে, ভাই লক্ষ্মণ, আমাদের আরাধ্য দেবতা পিতা ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকগমন করেছে বটে–কিন্তু অবিনশ্বর আত্মা, আত্মার মৃত্যু নেই। সেই রুহ, আজ বেহেশত-স্বর্গের দরজায় দাঁড়িয়ে স্বপ্নযোগে-খোয়াবে আমার শিয়রে এসে বলল :
>
> : ওরে রাম, লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন চারিটি পুত্রধন পৃথিবীর বুকে থাকতে, বল তোদের পিতা হয়ে আর কতদিন আমি এমনিভাবে ব্রহ্মহত্যা পাপের বোঝা মাথায় করে বইবো। ওরে রাম, আমাকে উদ্ধার করে দে। আমার এই আত্মার উদ্দেশ্যে পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপ্ত কর। (সাইমন, ২০০৪ : ৫২)

ভাষা প্রয়োগে প্রমিত বাংলা শব্দ ও বাক্যের মধ্যে অনায়াসে আরবি, ফারসি শব্দ যুক্ত করেন এবং পুরোপুরি আঞ্চলিক ভাষা না হলেও কিছুটা আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গি প্রয়োগ করেন। উদ্ধৃতিতে 'রুহ' আরবি শব্দ; অন্যদিকে 'বেহেশত', 'খোয়াব' ফারসি শব্দ। এক্ষেত্রে ভাষারূপের প্রবহমানতার 'বেহেশত-স্বর্গ', 'স্বপ্নযোগে-খোয়াবে' সমার্থক যুগ্মশব্দ প্রয়োগে অসাম্প্রদায়িক চেতনাযুক্ত হয়। উল্লেখ্য, আসরে গায়ক কর্তৃক এ ধরনের সমার্থক যুগ্মশব্দ ব্যবহারে সনাতন, বৈষ্ণব, ইসলাম ইত্যাদি ধর্মানুসারী দর্শক-শ্রোতা ধর্ম-মতাদর্শের মধ্যে ঐক্য অনুভব করেন। 'রামকীর্তনে'র আসরে রামায়ণের আখ্যান পরিবেশনে এ ধরনের আরবি, ফারসি শব্দের প্রয়োগ এখানেই থেমে যায় না, বরং তা আরও সম্প্রসারিত হয় গায়ক কর্তৃক পরবর্তী পর্যায়ের বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনায়।

গায়ক পূর্ববর্তী সংলাপের সূত্র ধরে দর্শক-শ্রোতাদের জন্য ধর্মের আচার এবং তার মারফতিসত্তা তথা আত্মতত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যায় নানা ধরনের আরবি শব্দের আশ্রয়ে বলেন :

> যেটা জানাজা। তবে, জানাজা শুধু সুরা জানলেই হয়তো হবে না। আত্মা সম্বন্ধে জানার বিশেষ প্রয়োজন। পাঁচ রুহ সম্বন্ধে যিনার জানা আছে, সেই ব্যক্তি দিয়ে জানাজা করলে অতি উত্তম। এটা তরিকাভুক্ত কথা। স্থূল প্রবর্ত সাধক সিদ্ধির কথা।
>
> তাই শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের কাছে যখন বললেন, তখন লক্ষ্মণ বললেন–
>
> : 'দাদা, আমাদের যে আছে কুল পুরোহিত, যিনি মুরশিদ-গুরুদেব, তার নিকটে নিশ্চয় জানালে তিনি হয়তো সমস্ত বিধান দেবেন।'

শ্রীরামচন্দ্র বললেন–

: ওরে লক্ষ্মণ, তাহলে তুমি কালবিলম্ব না করে অতিসত্বর গুরু আশ্রমে যাত্রা কর... ।
(সাইমন, ২০০৪ : ৫২)

উদ্ধৃতিতে 'জানাজা', 'সুরা', 'রুহ', 'মুরশিদ', 'তরিকা' বা তরিক' এই পাঁচটি আরবি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা গেছে, আর এই শব্দ প্রয়োগের ব্যাপারটি অহেতুক আসেনি। বরং রামায়ণের একটি ঘটনার সাথে ইসলামি একটি কৃত্যের সাদৃশ্য টেনে এ সকল শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কুষ্টিয়া অঞ্চলে সনাতন, ইসলাম, সাধুগুরু, বাউল-ফকির, বৈষ্ণব-সাধকদের ঐতিহ্যবাহী এলাকা, এই অঞ্চলে সকল ধর্মের সরলীকৃত ভক্তিবাদ লালন সাঁই ও তাঁর পরবর্তী কালের সাধকদের অবদান। তাই কুষ্টিয়া অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নাট্য পরিবেশনে অনায়াসে শাস্ত্রীয় ভাষা বা শিষ্টভাষার ব্যাপক প্রভাব যেমন স্বীকৃত, তেমনি আরবি-ফারসি ও কুষ্টিয়ার নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষার উদার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যায়।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণ থেকে বাংলাদেশের দুই অঞ্চলের দুটি ধ্রুপদী আখ্যান-নাট্যের পরিবেশনে ভাষা বিচারে প্রত্যক্ষ করা গেল যে, মৌখিকরীতিতে আঞ্চলিক গায়ক কর্তৃক পরিবেশিত ধ্রুপদী আখ্যান-নাট্যে সর্বজনগ্রাহ্য প্রমিত বা মার্জিত ভাষার প্রচলন স্পষ্ট; এছাড়া, পরিবেশনরীতির এদিকে যেমন সংস্কৃত শ্লোক বা সংস্কৃত শব্দ ও ভাষাভঙ্গির মিশ্রণ থাকে, অন্যদিকে তেমনি আরবি, ফারসি শব্দের প্রয়োগ প্রচ্ছন্ন থাকে। এ পর্যায়ে আদিবাসী সমাজে প্রচলিত নাট্যঐতিহ্যের ভাষারীতি পর্যবেক্ষণ করা যাক।

২.২ নৃগোষ্ঠী [আদিবাসী] নাট্যঐতিহ্য

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাসরত। বৃহত্তর অর্থে তাঁরা যেহেতু প্রধানত আদিম ও কৃষিভিত্তিক জীবন যাপনে অভ্যস্থ সেহেতু তাঁদের আদিবাসী হিসেবে অভিহিত করা যায়। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি আদিবাসী সমাজে, বিশেষ করে হাজং, গারো, ওঁরাও, মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা ইত্যাদি নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও নাট্যঐতিহ্য বর্তমান রয়েছে। তাঁদের ভেতর থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী [আদিবাসী] নাট্যঐতিহ্যের ভাষা বিচারের নিমিত্তে জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষায় প্রাপ্ত নেত্রকোনা অঞ্চলের হাজংদের (রাসমনি হাজং সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর নেতৃত্বে দুর্গাপুর-বগাউড়ার রাধাকৃষ্ণ সম্প্রদায়) পরিবেশিত 'দেবাসুর' বা 'মহিষাসুরবধ' পালার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, এ ধরনের নাট্যপালা মূলত বাংলার লোকায়ত দেবী *চণ্ডীমঙ্গলের* আখ্যানকে নির্ভর করে আসরে পরিবেশিত হয়।

বাংলাদেশের অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতির মতো হাজং সমাজে প্রচলিত 'মহিষাসুরবধ' শীর্ষক নাট্যপালার শুরুতেই থাকে বন্দনাগীত। যথা :

নমঃ নমঃ নারায়ণী জগত তারিণী
দুর্গাসুর বিনাশিনী দুর্গতি হারিণী॥
সর্বলোক নিস্তারিণী পতিত উদ্ধারিণী
কালী তারা তাপহারা সন্তোষ কারিণী॥
কালী তারা মহাবিদ্যা রাজা রাজ্যশ্বরী
শ্রীমতী ভুবনশ্বরী ভৈরব শঙ্করী॥
চন্দ্র রূপ রক্ষগণ রক্ষকতারিণী
অতি চণ্ডী রক্ষা কর অশুভ হারিণী॥...
মঙ্গল কর মা মঙ্গল চণ্ডী, মঙ্গলে রেখ মা জননী।
সুভক্তি প্রণয়ে নমি মা অভয়ে, জয় দেবী কৈলাসবাসিনী॥
নমস্তে হর জয় শ্রীগুণ মহামায়া, জয় দেবী কৈলাসবাসিনী।
জয় জয় চন্দ্রাবতী অম্বিকা ভগবতী, ভৈরব অভয়তারিণী॥
বিঘ্ন নাশিনী মোক্ষ প্রদায়িনী, রেখ পদ্মা ত্রিলোকতারিণী॥"[১১]

এই বন্দনাংশ পাঠে বোঝার কোনো উপায় নেই যে, এটা হাজংদের উপস্থাপিত নাট্যপালা থেকে উদ্ধৃত। কারণ, এর ভাষায় লোকভাষা তথা আঞ্চলিকতার তেমন কোনো মিশ্রণ যেমন নেই, তেমনি হাজংদের নিজস্ব ভাষারও প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না। এখানে মূলত শাস্ত্রীয় ভাষা কাঠামো অনুসরণে তথা সংস্কৃত বা তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব শব্দের প্রয়োগে শিষ্টভাষার উপস্থাপন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।

এ ধরনের বন্দনাগীতের পর হাজংদের নাট্যপালায় পার্ব্বতী ও দুর্গাসুরের যুদ্ধ দৃশ্যের অভিনয় প্রত্যক্ষ করা যায়। যে অভিনয়ের শুরুতে এক হাতে তরবারি আর অন্য হাতে ফলা অস্ত্র নিয়ে নৃত্যের তালে তালে মহামায়া বা দুর্গা মঞ্চে প্রবেশ করেন। একই সঙ্গে তাকে অনুসরণ করে ঢাল-তরবারি হাতে একজন কুশীলব অসুর রূপে নৃত্য যোগে মঞ্চে আগমন করেন। এক সময় তিনি তাঁর নৃত্যের মধ্যে নানা রকম অঙ্গ ভঙ্গি করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন এবং বলেন –

অসুর : হু হা হা হা। কে? কে তুমি নারী? আমায় সত্য পরিচয় দাও।

মহামায়া : সমরের প্রাঙ্গণে দেবতার আলয়ে কেন তুমি আসিলে হেথায়?

অসুর : এই তো আমি অসুর। তুমি আমাকে সত্য পরিচয় দেবে, না হলে তোমাকে আমি করতে পারি জানো?

মহামায়া : হ্যাঁ জানি। তোমার মতো তোমার মত কত সহস্র অসুর আমার পায়ের তলায় রেখে দিয়েছি। সেই পাপিষ্ট অসুর, আমার পরিচয় জানতে চায়ছো! জানো, আমি মহামায়া।

অসুর : মহামায়া! আজ তুমি কী চাও।

মহামায়া : চাই শুধু রাজ্য।

অসুর : রাজ্য! হু হা হা হা। তবে আয়, আয়রে মৃত্যুকামিনী নারী, তোকে রাজ্যের সাধ মিটিয়ে দেই॥[১২]

এখানে অসুর ও মহামায়া চরিত্রের সংলাপে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ রয়েছে, দুটি ক্ষেত্রেই শব্দ প্রয়োগে কিছুটা গীতল ভাব ও পুরানো ভঙ্গি প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, বিশেষ করে 'সমরের প্রাঙ্গণে', 'দেবতার আলয়ে', 'আসিলে হেথায়' ইত্যাদি শব্দের বিন্যাসে গঠিত বাক্যে সাধু ভাষার পুরানো ভঙ্গির নিদর্শন দৃষ্ট হয়, অন্যদিকে যখন মহামায়া তার সংলাপে বলেন–'আমার পরিচয় জানতে চায়ছো! জানো, আমি মহামায়া।' এ ধরনের সংলাপ থেকে কথ্যরীতি বা চলিত ভাষার একেবারে সাদামাটা দৃষ্টান্ত প্রকাশ পায়। আসলে, হাজংদের এই নাট্যের বন্দনাংশে যেভাবে সংস্কৃত প্রভাবিত শিষ্টভাষারীতির প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা যায়, নাট্য পরিবেশনের সংলাপে তা কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে মিশ্ররীতির ভাষা কাঠামো গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী নাট্যের নানা ধরনের ক্ষেত্রসমীক্ষণ বা জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণে ধ্রুপদী আখ্যান-নাট্যসমূহ মৌখিকরীতির হলেও যতটুকু শিষ্ট বা মান্যভাষায় পরিবেশিত হয়ে থাকে, আদিবাসী নাট্যঐতিহ্য ততটুকু শিষ্ট বা আদর্শভাষা বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে না। বন্দনাগীত বা অন্যান্য গীতে কিছু সংস্কৃত প্রণাম বা শ্লোকের ব্যবহার বা তৎসম, অর্ধতৎসম, ও তদ্ভব শব্দের নানা ধরনের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা গেলেও সংলাপে আদিবাসী নাট্যঐতিহ্য মিশ্ররীতির ভাষা ব্যবহার করে। আসলে, ক্ষেত্রবিশেষে আদিবাসী নাট্যঐতিহ্যের পরিবেশনে দু'একটি আঞ্চলিক শব্দ-বাক্য বা ভাষাও ব্যবহৃত হয়। একই ধরনের চিত্র *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে*র আখ্যান নির্ভর পরিবেশনাসমূহেও প্রত্যক্ষ করা যায়। এমনকি কারবালার ইতিহাস নির্ভর উপন্যাস মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'বিষাদ-সিন্ধু'র আখ্যান আশ্রিত 'ইমামযাত্রা'র পরিবেশনাতে প্রমিত বাংলার ভাষা প্রয়োগ করা হয়। এবারে ইসলামের ইতিহাসকেন্দ্রিক সে ধরনের একটি নাট্যপালার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

২.৩ ইসলামের ইতিহাসকেন্দ্রিক নাট্যঐতিহ্য

ইসলামের ইতিহাসের করুণ ও মর্মান্তিক ঘটনার একটি উদাহরণ হলো – কারবালার যুদ্ধ ও তার পরিণতি। এই যুদ্ধের পরিণতিতে এজিদ ও তার সৈন্যদের কাছে ইসলামের সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসাইন সপরিবারে শহিদ হন। সেই করুণ ও মর্মান্তিক ইতিহাসকে সাক্ষ্য মেনে এবং প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর বংশ নিধনের বেদনা প্রকাশের নিমিত্তে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে জারি-মর্সিয়াসহ নানা ধরনের নাট্যপালা পরিবেশিত হয়। এ ধরনের একটি নাট্যপালার ভাষা বিচারের জন্য মানিকগঞ্জের চরখ--গোলরা গ্রামে

চাঁনমিয়া পির সাহেবের বার্ষিক ঔরস উপলক্ষে পরিবেশিত 'ইমামযাত্রা'র কিছু অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া যাক।

নিম্নে উদ্ধৃত 'ইমামযাত্রা'র অংশটুকু "শহীদে কারবালা" শীর্ষক পালার থেকে গৃহীত হয়েছে।

এজিদ : মহামন্ত্রী মারোয়ান! এই অপরূপ সুন্দরীটিকে?

মারোয়ান : জনাব, এতো দেখছি আমাদেরই রাজ্যের এক সাধারণ প্রজা আব্দুল জব্বারের স্ত্রী বিবি জয়নব।

[জয়নব কলসিতে জল নিয়ে এজিদকে তোয়াক্কা না করে পাশ কাটিয়ে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করেন। তখন এজিদ মারোয়ানকে বলেন]

এজিদ : মহামন্ত্রী মারোয়ান, আমাদের রাজ্যের সাধারণ প্রজা আব্দুল জব্বারের স্ত্রী বিবি জয়নব! জয়নব জয়নব! মহামন্ত্রী মারোয়ান, আমাকে দেখার জন্য দামেস্কের হাজার হাজার নর-নারী রাস্তায় কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। আর সামান্য আব্দুল জব্বারের স্ত্রী জয়নব আমাকে করলো এতো অবহেলা! মহামন্ত্রী মারোয়ান এযে আমি সইতে পারছি না। মহামন্ত্রী মারোয়ান, আমি দেখতে চাই বিবি জয়নবের রূপের কত গৌরব। মহামন্ত্রী মারোয়ান, চলো এবার আমরা অন্তঃপুরে গমন করি।

মারোয়ান : তাই চলুন জনাব।

[এজিদ ও মারোয়ান উভয়ে প্রস্থান করেন। কিন্তু তার ঠিক পর মুহূর্তে এজিদ আবার মঞ্চে প্রবেশ এবং আত্মকথনমূলক সংলাপে বলতে থাকেন]

এজিদ : একি রূপ আমি আজ হেরিলাম! ভুলিতে নাহি পারি। শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে শুধু তাকেই স্মরণ করি। জানি না আজ কিসের মোহে কোন পথে চলছি একা। ওগো জয়নব এই যন্ত্রণা হতে বাঁচাইবে কি তুমি? কিসের মোহে ধন-সম্পদ, রাজ্য-সিংহাসন ছেড়ে তোমারই তরে ভিখারী হয়ে তেজিব প্রাণ। ওগো জয়নব, ওগো জয়নব, তুমি দাও মোরে দরশন।

[এজিদের এই কথার মধ্যে তার পিতা মাবিয়া প্রবেশ করেন]

মাবিয়া : পুত্র, আমি লক্ষ করছি দিন দিন নিজেকে তুমি যেন ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছো। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কি যেন অশান্তি ভোগ করে চলেছো। বল পুত্র, কি তোমার বাসনা, কি তোমার কামনা? কেন তুমি নিজেকে তিলে তিলে নিঃস্ব করে দিচ্ছো। বল পুত্র, বল আমার কাছে খুলে বলো।

এজিদ : পিতা, আমার অপরাধ মার্জনা করবেন। আমি নিজেও বলতে পারছি না কেন আমার এই পরিণতি! তবে কি যেন না পাওয়ার ব্যথায় আজ আমি দুঃখে জর্জরিত। আর বেশি কিছু আপনার কাছে বলতে পারছি না।

মাবিয়া : তোমার কথা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি না পুত্র। কি না পাওয়ার ব্যথায় আজ তুমি এমন করে ভুগছো। মনে রেখো তুমি দামেস্কের রাজপতি সম্রাট মাবিয়ার একমাত্র পুত্র, এই অতুল ঐশ্বর্য, ধন-সম্পদ, অসংখ্য সৈন্য সামন্ত সবই তোমার মাথায় শোভা পাবে। এরপর তোমার কিসের অভাব! কি না পাওয়ার যন্ত্রণা?

এজিদ : তা বলতে আমার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে পিতা। তা আমি কিছুতেই আপনার কাছে প্রকাশ করতে পারছি না পিতা।[১৩]

"শহীদে কারবালা" শীর্ষক 'ইমামযাত্রা'র উদ্ধৃত সংলাপসমূহে ভাষা প্রয়োগের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়; এখানে সংলাপের ভাষায় যেমন শিষ্ট বা মান্য ভাষাভঙ্গি দুর্লক্ষ্য নয়, তেমনি লোকভাষা ভঙ্গির চরিত্র লক্ষণও স্পষ্ট। এছাড়া, সংলাপের গাঁথুনিতে মান্যভাষার প্রভাব বেশ প্রচ্ছন্ন। এখানে সংলাপে মান্যভাষার প্রভাব সম্পর্কে বলতে গেলে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা অতীব প্রয়োজন, তা হল— মানিকগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত 'ইমামযাত্রা'র সংলাপে শিষ্টভাষা প্রয়োগের মূল নিয়ামক হচ্ছে—মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাস। কারণ, 'ইমামযাত্রা'র পাণ্ডুলিপি মূলত 'বিষাদ-সিন্ধু'র ঘটনাবিন্যাস ও ভাষাকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে।[১৪] আর উপন্যাসটি সাধুভাষায় রচিত এবং তৎসম, অর্ধসৎসম, তদ্ভব শব্দের ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ।

ইমামযাত্রা'র এ ধরনের লিখিত পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব দৃষ্টে কোনো কোনো শিক্ষিত পণ্ডিত হয়তো নাট্যশাস্ত্রের প্রচলিত নীতিজ্ঞানে একে ঐতিহ্যবাহী নাট্য হিসেবে স্বীকৃতি দিতে সংকোচ বোধ করতে পারেন। কিন্তু, মনে রাখা প্রয়োজন, এটা বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির একান্তই নিজস্ব ভাবসম্পদ এবং প্রাণের সামগ্রী।

উল্লেখ্য, মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' অবলম্বনে শুধু 'ইমামযাত্রা'র পাণ্ডুলিপিই রচিত হয়নি, তার একটি মৌখিক ঐতিহ্য 'জারিগান' বা 'বিষাদ-জারি' নামে বহুদিন ধরে নেত্রকোনা জেলার বিভিন্ন উপজেলার বহু গ্রামে প্রচলিত রয়েছে। শুধু তাই নয়, উক্ত অঞ্চলে 'বিষাদ-জারি'র এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক আসর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ ধরনের আসরে মাঝে মধ্যে 'বিষাদ-সিন্ধু'র অনুসরণে সাধারণত তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব শব্দের প্রয়োগে শিষ্ট বা মান্যভাষা যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি লোকভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষার ধুয়া-দিশা-ডাক ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। (সাইমন ও নাজমীন, ২০১২)

এ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া যেতে পারে, 'ইমামযাত্রা'র লিখিত পাণ্ডুলিপি বা মৌখিকরীতির 'বিষাদ-জারি'র মূল পরিবেশনে সর্বজনগ্রাহ্য তথা মান ভাষা প্রয়োগের দুইটি কারণ রয়েছে – প্রথম কারণটি হল – খ্রিষ্টীয় উনিশ শতকের সাধু ভাষায় রচিত 'বিষাদ-সিন্ধু'র লিখিতরূপ অনুসৃত হবার জন্যেই পরিবেশনের ভাষায় শিষ্টরূপ রক্ষিত হয়; দ্বিতীয় কারণটির সাথে ভক্তিরস যুক্ত রয়েছে, যেহেতু পরিবেশনের কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহ ইসলাম ধর্মের শীর্ষতম ব্যক্তিত্বের পরিবারের সদস্যবর্গ। ক্ষেত্রবিশেষে লোকভাষার আঞ্চলিক শব্দ ও কথ্যভাষা প্রয়োগের কারণ হল – দর্শক-শ্রোতাদের অধিকাংশ ব্যক্তি আঞ্চলিক পরিসীমার, 'বিষাদ-জারি'র ক্ষেত্রে সাধারণত মূলকাহিনির বাইরে ধুয়া, দিশা, ডাক ইত্যাদি পর্যায়ে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা যায়।

ইসলামের ইতিহাসকেন্দ্রিক নাট্যঐতিহ্যের পাশাপাশি নানা ধরনের লৌকিক পির-মুরশিদ তথা গাজীপির, মাদারপির, মানিকপির প্রমুখের মাহাত্ম্যপ্রকাশক আখ্যান-নাট্যের পরিবেশনাতে অনেকক্ষেত্রে শিষ্টভাষার প্রয়োগ লক্ষণীয়। যদিও প্রায় সকলক্ষেত্রে পরিবেশনাকারী শিল্পগণ বিদ্যালয়ের বা কোনো ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, সেই বিচারে তাঁরা নিরক্ষর; তবে, ক্ষেত্রবিশেষে স্বশিক্ষিত; তাঁরা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় লৌকিক পিরের আখ্যান-নাট্যের পরিবেশনে শিষ্টভাষা প্রয়োগে স্বতঃস্ফূর্ত থাকেন। যেমন – টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার মীরদেওহাটা গ্রামের লিয়াকত সরকার দোহার-বাদ্যযন্ত্রীদের সহযোগিতায় একক অভিনয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ শিষ্টভাষায় 'গাজীর পালা' পরিবেশন করেন।(সাইমন, ২০০৭ : ১৭-৬০) অন্যদিকে কিছু কিছু এক্ষেত্রে এ ধরনের পির মাহাত্ম্যের আখ্যান আঞ্চলিক ভাষার মাধুর্যের ভেতর দিয়ে পরিবেশিত হয়, যেমন – ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা থানার দুধসর গ্রামের রওশন আলী জোয়ারদার দলীয়ভাবে নাটকীয় অভিনয় তথা চরিত্রানুযায়ী সাজ-পোশাক গ্রহণপূর্বক সংলাপ, গীত, বর্ণনা সহযোগে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া জেলার মনোহরী লোকভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় 'গাজীর গানের ফোকরের পালা'র পরিবেশন করেন। (সাইমন, ২০০৪ : ৯২) এক্ষেত্রে শিষ্টভাষার মহাপ্রাণ ধ্বনিসমূহ স্বল্পপ্রাণে রূপান্তরিত হাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ, আগেই বলা হয়েছে, কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ অঞ্চলের লোকভাষায় অনেকক্ষেত্রে মহাপ্রাণ ধ্বনি স্বল্পপ্রাণে রূপান্তরিত হয়।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের অন্যান্য যে সকল পরিবেশনে লোকভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা বিশেষ গুরুত্বের সাথে ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে স্থানীয় লোককাহিনি, রূপকথা, উপকথা, আখ্যান-গীতিকা ইত্যাদি পরিবেশন উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত ও দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত-সম্পাদিত *মৈমনসিংহ-গীতিকা*'র আখ্যানসমূহে আঞ্চলিক পর্যায়ে 'কিচ্ছা' বা 'কিচ্ছাগান', 'কিচ্ছাপালা' নামে বৃহত্তর ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষায় পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে তার একটি দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা যেতে পারে।

২.৪ লোককাহিনি বা আখ্যান-গীতিকার নাট্যঐতিহ্য

বাংলাদেশের সামাজিক মানুষের নিজস্ব জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে লোককথার আখ্যানে রূপান্তরকে লোককাহিনি বলা যেতে পারে; যা কখনো গল্পকথনের ভঙ্গিতে, কখনোবা গীতির কাঠামোতে আখ্যান-কাহিনি আকারে মুখে মুখে রচিত হয়ে থাকে। দেব-দেবতার বন্দনা বা সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষের বন্দনা এ ধরনের লোককাহিনি বা আখ্যান-গীতিকাতে পাওয়া দুর্লভ, তার পরিবর্তে এ ধরনের আখ্যান-গীতিকা বা লোককাহিনিতে সবকিছুর ঊর্ধ্বে সাধারণ মানুষের জীবন-মাহাত্ম্য বন্দিত হয়ে থাকে। তাই লোককাহিনি বা আখ্যান-গীতিকা নির্ভর নাট্যঐতিহ্য সাধারণ মানুষের ভাষারীতি তথা আঞ্চলিক ভাষা অত্যন্ত সচেতনভাবে গৃহীত হয়েছে বা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমেই তার সমূহ ভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিংশ শতকের শুরুর দিকে চন্দ্রকুমার দে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে এ ধরনের আখ্যান-গীতিকা সংগ্রহ করেন এবং দীনেশচন্দ্র সেন তা সংকলন, গ্রন্থন ও সম্পাদনের মাধ্যমে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন, যার নাম দেওয়া হয়েছিল – *মৈমনসিংহ-গীতিকা*। এই গীতিকায় স্থান পাওয়া এবং না পাওয়া অনেক লোককাহিনি বা আখ্যান 'কিচ্ছা' বা 'কিচ্ছাগান', 'কিচ্ছাপালা' নামে অদ্যাবধি বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ইত্যাদি জেলাতে একক গায়ক-শিল্পী কর্তৃক দোহার-বাদ্যযন্ত্রীদের সহযোগিতায় পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ ধরনের কিচ্ছা পরিবেশনের জন্য কুদ্দুস বয়াতী, ইসলামউদ্দিন কিচ্ছাদার, দিলু বয়াতী, মিলন বয়াতী, খোকন বয়াতী প্রমুখ উক্ত অঞ্চলের শিল্পীদের মধ্যে অত্যন্ত খ্যাতিমান।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত আখ্যান-গীতিকা তথা 'কিচ্ছা' বা 'পালাগানগুলি'র ভাষারীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা*-র তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা-র ভূমিকায় লিখেছেন :

> পালাগানগুলির এই সংখ্যা ও পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যাগুলির মধ্যে ভাষাসম্বন্ধে অনেক বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। বঙ্গভাষার এখনও কোন নিজস্ব ব্যাকরণ রচিত হয় নাই। যাঁহারা এযাবৎ বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই সম্পূর্ণভাবে পাণিনি অথবা বোপদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, নিজের স্বাধীন চিন্তা বা চেষ্টা দ্বারা কিছু নূতন জিনিষ দিয়া যান নাই। ভবিষ্যতের বৈয়াকরণিক ও ভাষা-সন্ধানকারীদের কার্য্যের সুবিধার জন্য পালাগানের অন্তর্গত ভাষার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা প্রয়োজনীয়।(দীনেশচন্দ্র, ১৯৩০ : ভূমিকা ১)

এরপর দীনেশচন্দ্র সেন ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পালাসমূহের ভাষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেন এভাবে :

(১) 'হ' প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া 'অ' হইয়া থাকে। একজন পশ্চিমবঙ্গের লোক যে স্থলে 'হাঁ' বলেন, পূর্ব্ববঙ্গের [তথা ময়মনসিংহের] একজন লোক সেই স্থলে বলিবেন 'অয়'। এই সমস্ত পালাগানে আমরা 'হিন্দু' স্থানে 'ইন্দু', 'হাতী' স্থানে 'আতি', 'হেন' স্থানে 'এন', 'হইয়া' স্থানে 'অইয়া', 'হইব' স্থানে 'অইব', 'মহাল' স্থানে 'ময়াল' দেখিতে পাই।

(২) 'ও' প্রায়ই 'উ'-তে পরিণত হয়; যথা, 'কোণা'–'কুণা', 'কোরাণ'–'কুরাণ', 'ছোট'–'ছুটু', 'বোচকা'–'বুচকা', 'জোখা' (লেখা-জোখা)–'জুখা', 'গোয়াইল'–'গুয়াইল', 'ষোল'–'ষুল', 'সোত' (স্রোত)–'সুত', 'প্রবোধ'–'পরবুদ', 'সোদর'–'সুদুর', 'সোনালী'–'সুনালী', 'সোয়ার' (ঘোড়-সওয়ার)–'সুয়ার', 'মোচ' (গুম্ফ)–'মুচ', 'যোগ'–'যুগ', 'কোল' (ক্রোড়)–'কুল', 'খোল' (উন্মুক্ত করা) স্থলে 'খুল'।

(৩) 'উ' কখনো কখনো পরিবর্ত্তিত হইয়া 'ও' হইয়াছে; যথা, 'তুফান' স্থলে 'তোফান'।

(৪) 'ট' ও 'ঠ' স্থানে 'ড'; যথা, 'ছোট' স্থলে 'ছুডু', 'কাঠি' স্থলে 'কাডি', 'পাঁঠা' স্থলে 'পাঁডা'।

(৫) 'ঢ' স্থলে 'ড'; যথা, 'ঢোল' স্থলে 'ডুল'।

(৬) 'ন' স্থলে 'ল'; যথা, 'নাড়া' স্থলে 'লাড়া'।

(৭) পূর্ব্ববঙ্গীয় [ময়মনসিংহ অঞ্চলের] ভাষায় 'স' ও 'শ'-কে প্রায়ই 'হ'-তে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। ইহার উদাহরণ এত বেশী যে অধিক দিবার প্রয়োজন নাই। 'সেই' স্থলে 'হেই', 'সেওলা' স্থলে 'হেওলা', 'সাজি' স্থলে 'হাজি', 'শালা' স্থলে 'হালা', 'শুধু' স্থলে 'হুদু', 'শত' স্থলে 'হত' প্রায়ই পাওয়া যায়। 'শত' স্থানে 'হত' প্রয়োগের একটি রহস্যজনক গল্প আছে। একটি সংস্কৃত শ্লোক পশ্চিমবাসীদিগকে পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতদের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছে; কারণ আশীর্ব্বাদ-কালীন 'শতায়ুস্ত্বং ভবিষ্যসি' স্থলে পূর্ব্ববঙ্গীয় পণ্ডিত বলিবেন, 'হতায়ুস্ত্বং ভবিষ্যসি' – অর্থ দাঁড়াইবে বিপরীত।

(৮) কয়েক স্থলে আবার 'হ'-এর পরিবর্ত্তে 'স'-এর ব্যবহার দেখা যায়; যথা, 'হেন কালে' স্থানে 'সেন কালে', 'হাতী' স্থানে 'সাতি'।

অনেক স্থলে প্রায় অকারণেই কোন কোন শব্দে একটি অতিরিক্ত স্বরবর্ণ যুক্ত হইয়া থাকে; যথা, 'কন্যা' স্থলে 'কৈন্যা', 'বক্ষ' স্থলে 'বৈক্ষ', 'লক্ষ্য' স্থলে 'লৈক্ষ্য', সন্ধান স্থলে 'সৈন্ধান', 'অঞ্চল' স্থলে 'ঐঞ্চল'। এখানে 'ঐ'-এর ব্যবহার অকারণ। আবার এইরূপ ভাবেই অনেক স্থলে 'উ' স্বরবর্ণটিকে শব্দমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়; যথা, 'রাখাল' স্থলে 'রাউখাল'। 'কবর' স্থলে 'কয়বর' কথায় এইরূপে 'য়'টি প্রথম ও

দ্বিতীয় বর্ণের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে। কখনো কখনো কোন কোন বর্ণের লোপ হয়; যথা, 'মহাজন' স্থলে 'মাজন'; এ ক্ষেত্রে কেবল 'হ'টি লুপ্ত হইয়াছে এবং 'আ'কার 'ম'কারের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। 'মোড়ল' স্থানে 'মড়ল' হওয়ায় 'ও'কার লুপ্ত হইয়াছে এবং 'স্থান' শব্দের পরিবর্তে 'থান', 'স্তন'-এর পরিবর্তে 'তন' হওয়ায় 'স'কারের লোপ পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ব্ববঙ্গের [ময়মনসিংহ অঞ্চলে] ভাষায় বর্ণেও দ্বিত্ব-বিধান আর একটি বিশেষত্ব; যথা, 'হুকা' স্থলে 'হুক্কা', 'শিকা' (শিকে) – 'শিক্কা'। (দীনেশচন্দ্র, ১৯৩০ : ভূমিকা ১-৩)

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যপালা 'কিচ্ছা'র পরিবেশনে অনেকক্ষেত্রে উপর্যুক্ত ভাষা বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়। সেইসঙ্গে ক্রিয়াপদ ব্যবহারে আরেকটি ভাষাবৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়; যেমন – ক্রিয়াপদের সাথে অধিকাংশক্ষেত্রে ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে 'বাম' ও 'তাম' শব্দাংশ যুক্ত করা হয়; যথা, 'করবো'র পরিবর্তে 'করবাম', 'যাইবো'র পরিবর্তে 'যাইবাম'; এছাড়া, ক্ষেত্রবিশেষে ক্রিয়াপদের সাথে 'তাম' শব্দটিও যুক্ত হয়, যথা – 'করবো'র পরিবর্তে 'করতাম', 'খাইবো'র পরিবর্তে 'খাইতাম' ইত্যাদি।

এবারে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার নোয়াবাদ গ্রামের ইসলাম উদ্দিন কিচ্ছাদার পরিবেশিত *উতলা সুন্দরী ও কাকাধরের খেলা* শীর্ষক কিচ্ছার উদ্ধৃতি দিয়ে উপর্যুক্ত ভাষাবৈশিষ্ট্য খুঁজে দেখা যেতে পারে। এ ধরনের কিচ্ছার শুরুতেই থাকে বন্দনা, যথা :

পাষাণ মন ওরে আমার।
ওরে হরদমে লইও আল্লার নাম
প্রথমে আল্লাজীর নামে আমি কিচ্ছা করলাম শুরু। হায় হায় কিচ্ছা করলাম শুরু।
দ্বিতীয় বন্দনা গো করলাম রাসুলের পাক পায়ে।
পুবেতে বন্দনা করলাম পুবে ভানুশ্বর। হায় হায় পুবে ভানুশ্বর।
একদিকে উদয় গো ভানু চৌদিকে পসর ॥ ও মন ওরে...
উত্তরে বন্দনা করলাম হিমালয় পর্বত। হায় হায় হিমালয় পর্বত।
যেখানে পাঠায়ছে আলী মালামের পাথর।
হাত উঠায় মারে গো পাথর বুক পাতিয়া ধর। হায় হায় বুক পাতিয়া ধর।
বিপদে পড়িয়া মানুষ আল্লার নামটি ধর ॥ পাষাণ মন ওরে...
দক্ষিণে বন্দনা করলাম ক্ষীর নদী সাগর। হায় হায় ক্ষীর নদী সাগর।
যেখানে বাইতো গো ডিঙ্গা চান্দ সওদাগর। পাষাণ মন ওরে...॥
পশ্চিমে বন্দনা করলাম মক্কা বড় স্থান। হায় হায় মক্কা বড় স্থান।
যেখানে হয়ছিল নাজিল কিতাবও কুরান।

পশ্চিমে বন্দনা করলাম আলীরও রওজায়। হায় হায় আলীরও রওজায়।

তুমারও কৃপায় পাইবো রসুলের চরণ। পাষাণ মন ওরে...

চারকুনা বন্দনা করলাম মন করিলাম স্থির। হায় হায় মন করিলাম স্থির।

তীরের আগায় বান্ধি লইলাম আশি হাজার পির।

আশি হাজার পির বান্ধিলাম আমি নয় লাখ পয়গম্বর। হায় হায় নয় লাখ পয়গম্বর।

গাজী কালুর চরণ বান্দি সুন্দরবন বন্দর। পাষাণ মন ওরে...

সভা করে বয়ছেন যত আমার ভক্ত শ্রোতাগণ। হায় হায় ভক্ত শ্রোতাগণ।

ভক্তেরও চরণে রইল আমারও সালাম।

ভুল যদি করি আমি আসরের মাঝারে। হায় হায় আসরের মাঝারে।

ছেলে বলে করবেন ক্ষমা সভার এই দরবারে। পাষাণ মন ওরে...

উস্তাদেরও চরণ বান্ধলাম বসিয়া আসরে। হায় হায় বসিয়া আসরে।

উস্তাদ যদি করেন দয়া তরাবো আসরে।

পিতা মাতার চরণ বান্ধলাম বসিয়া আসরে।

সেইও মায়ে জন্ম দিয়ে দিল যে বাড়ায়ে।

পাষাণ মনওরে হরদমে হরদমে লইও আল্লার নাম...॥

[বন্দনাগীত শেষ করে ইসলাম উদ্দিন ভিন্ন একটি গানে গেয়ে পালার মূল আখ্যানে ঢুকে পড়লেন]

সুনাপুরে বাড়ি তার গো ও গুণের বাবা, সুনাপুরে ঘর।

ওরে বান্ধে বাড়ি কাহারও আশায় বান্ধে সারে সারে গো।

এই যে, বাড়িরও ভিতরে বাবা সুনারও যে পুরী।

আবার ভিতরে বানাইল বাদশা সভা করবার বাড়ি।

... ...

সভা কইরা আছিন যত ভদ্র শ্রোতাগণ

কাকাধরের খেলা কিচ্ছা এখন করিবো বর্ণন॥

আল্লাপাক দিছে তারে বুড়া। আল্লাপাকের ইচ্ছায় পুরী বান্ধছে, বাড়ি বান্ধছে, বাদশার জন্ম নিয়েছে-এ কোন শহর?

: আই?

: সুনাপুর শহর।

: ওই

বাদশা ইব্রাহিম নাম ডাকিয়া জানাই খবর। ওই যে ডাকিয়া কথা বলে উজিরের দরবারে :

: উজির?

: মুনিব।

: তুমার কাছে আমি মনস্তাব রাখি।

: কিরম মনস্তাব?

: আল্লা পাকের দুয়াতে আমি বারো মুল্লুকের বাদশা হয়েছি সুনাপুর শহরে। আল্লা পাকে আমার কাঞ্চনলীলা, সুনামানিক কুনু দিক দিয়ে রাখছেনি বাকি। আমি শোনো ইব্রাহিম বাদশা যদি ইচ্ছা করি সুনা দিয়া বান্ধতাম পারি রাজ্যের চারকুনা...

ওই বলিয়া প্রভুজী –

: উজির?

: হুঁ।

: মাছে চিনে গহিন গাঙের পানি

পাখি চিনে ডাল।

মায়ে জানে পুতের বেদন

যার তিনডা ছাল।

আমি আল্লার দরবারে পাঁচ ওকতো নামাজ পড়ি, সকাল বিকাল কুরান পড়ি। আল্লা পাকে আমাকে বারো মুল্লুকের বাদশাহী দান করেছে সুনাপুর শহরে। কুনু দিক আল্লা আমারে রাখছে না কুম করে...কিন্তু আমি এক দুঃখের দুঃখী...।

: কির'ম দুঃখ?

আল্লা আমার ছেড়াক না দেন সুনাপুর শহরে।

ওরে মানষেরেও দেখিবে আল্লা সন্তান আছে ঘরে।

আমারে দেখিবে কে গো বলি যে তুমারে।

ওরে সন্তানেরও পাগল আমি আমার সন্তান নাই।

কী অপরাধ করছি আমি দুনিয়ার মাঝারে।

সন্তান দিয়ে করবেন বিধি গো সুখী আমারও দরবারে॥

হায় গো আল্লা তোমায় না চিনিয়া

জীবনে কি করলাম আল্লা গো॥

ওরে কী অপরাধ করছি গো আমি এই দুনিয়ার মাঝারে।

আমার কি নিয়া করবেন তিনি ক্ষমাবেন আমারে।

সন্তান কি আর পাবো আমি গো বিধি অপরাধ খণ্ডালে।

আমার সুময় হয় আশি বছর সন্তানও নাই ঘরে।

আটকুড়া হয়ে বেঁচে থাকি কেমনে এ শহরে।

উজির রে... আটকুড়া হয়ে কেমনে বাঁচি।

হায় হায়... মরিব মরিব একটা সন্তানের কারণে।

আমি সকাল-বিকাল কুরান পড়ছি আল্লারই দরবারে।

পাঁচ ওক্‌তো যে নামাজ পড়ছি আল্লারই দরবারে।

ওরে তবু আল্লায় দেয় না সন্তান আমার এ দরবারে।

কী আর করে বাঁচি আমি লুকসভার মাঝে...

বাদশা বলে –

: উজির

: জী

: আমি আল্লার দরবারে পাঁচ ওক্‌তো নামাজ পড়ি, সকাল বিকাল কুরান পড়ি। কিন্তু আল্লা পাক আমাকে কুন পুত্র সন্তান দেয় না। আমি কুন জায়গায় যাইতে পারি না। প্রজারা সবাই আমাকে আটকুড়া বাদশা বলিয়া ধিক্কার দেয়। আমি লুকসভায় গিয়ে মুখ দর্শন করতে পারি না শুধু একটা সন্তানের কারনে... প্রজারা আমাকে ঘৃণা করে। যে প্রজারা আমাকে ঘৃণা করে আমি চাই না – সে প্রজাদের কাছে আমার মুখ দর্শন দিই... আমি এখন চলে যাবো কোথায় জানো –

: আই?

আমি চলে যাবো আমার স্ত্রীর কাছে...জিজ্ঞাসা করতে চাই তারে বিয়ে করেছি কত বছর হয়েছে... আমি অদ্য শুনে দেখবো যে জগতে তুমি নারী... যদি তুমি কুন সন্তান আমারে না দাও তবে কি করবাম জানো...

: কি?

: আমি দ্বিতীয় একটা বিয়া করবাম...। (সাইমন, ২০০৪ : ৫৬-৬১)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে দীনেশচন্দ্র সেনকৃত এবং সেই সঙ্গে আমাদের নির্দেশিত ভাষাবৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পাওয়া যায়; লক্ষণীয় যে, উদ্ধৃতাংশে 'করবো'র পরিবর্তে যেমন 'করবাম' শব্দটি রয়েছে, যেমন 'লোক' বা লোকসভা-র পরিবর্তে 'লুক' বা 'লুকসভা', 'হাটকুড়া'র পরিবর্তে 'আটকুড়া', 'সোনপুর'-এর পরিবর্তে 'সুনাপুর', 'সোনামানিক'-এর পরিবর্তে 'সুনামাণিক', 'কোন'-এর স্থলে 'কুন' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষার নিজস্বতার পরিচয় বহন করে। আসলে, লোককাহিনি জনমানুষের সমাজ পরিচয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে বলেই তার ভাষারীতির ভেতর কোনো কৃত্রিমতা থাকে না।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'নিরক্ষর জেলে ও কৃষক মেয়েদের নিকট' থেকে এ ধরনের 'কিচ্ছা' বা 'পল্লিসঙ্গীতে পালা গান' সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'পল্লি কবি পল্লি-সুলভ ভাষায় ও ভাবে' 'গ্রাম্য পরিবারের অশ্রুপূর্ণ' 'ট্রাজেডি' ব্যক্ত করেন। (অদ্বৈত, ২০১১ : ৭৮) এই 'পল্লি-সুলভ ভাষা'র মাধ্যমেই বাঙালির নিজস্বতার পরিচয় প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভাষার আলোচনা-বিশ্লেষণে তা বারবার উপেক্ষিত

হয়েছে, তাই দীনেশচন্দ্র সেন সুগভীর খেদ প্রকাশপূর্বক *মৈমনসিংহ-গীতিকা*র প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যার ভূমিকায় বিস্তৃত আলোচনার শেষে বলেছেন :

> বাঙ্গালা ভাষাটা প্রাকৃতের রূপভেদ। কিন্তু টোলের এই ভাষায় অপর্য্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দ আনয়ন করিয়া ইহার শ্রী বদলাইয়া দিয়াছেন; এইজন্য কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সংস্কৃত যুগের পূর্ব্ব সাহিত্য, বিশেষ এই গীতিকাগুলি [*মৈমনসিংহ-গীতিকা*] পাঠ করিলে সে ভুল ঘুচিয়া যাইবে। খাঁটি বাঙ্গালা যে প্রাকৃতের কত নিকট ও সংস্কৃত হইতে কত দূরবর্ত্তী তাহা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে। (দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩ : (১৭)-(১৮))

অর্থাৎ লোককাহিনি বা আখ্যান-গীতিকা (গাঁথাকাব্য)-এর বিষয়াবলী নিয়ে 'কিচ্ছা' নামের যে নাট্যঐতিহ্য ময়মনসিংহ অঞ্চলে চর্চিত হচ্ছে, তা বিষয়ের দিক থেকে যেমন বাংলাদেশের নিজস্ব ভাবসম্পদ তেমনি তাতে প্রতিফলিত ভাষারীতিও আমাদের মৌলিক পরিচয়ের অবলম্বন হতে পারে। এই নিজস্বতার পরিচয়ের প্রকাশ শুধু লোককাহিনি বা আখ্যান-গীতিকার ভেতরেই খুঁজে পাওয়া যায় না, এখনও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত নানা ধরনের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নির্ভর নাট্য পরিবেশনের মধ্যে। একদিকে তাতে জনসমাজের বর্তমান রূপ যেভাবে প্রতিফলিত হয়, অন্যদিকে জনসমাজে প্রচলিত সমকালীন ভাষার প্রকৃতি ও স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এ পর্যায়ে সে ধরনের একটি নাট্যঐতিহ্যের উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

২. ৫ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-নির্ভর নাট্যঐতিহ্য

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যে শুধু ধ্রুপদী আখ্যান, নানাবিধ ধর্মীয় কাহিনি, লোককাহিনি ইত্যাদি উপস্থাপিত হয় না, একই সঙ্গে কিছু কিছু নাট্যঐতিহ্যের ভেতর দিয়ে গ্রামীণ মানুষের জীবনচিত্র তথা পরিবারিক ও সমাজিক পরিমণ্ডলের বিবিধ ঘটনা বিভিন্ন উপায়ে পরিবেশিত হয়ে থাকে। জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণে দেখা যায় যে, অন্যান্য নাট্যাঙ্গিকের চেয়ে গ্রামীণ মানুষের ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ইত্যাদি জীবন নির্ভর নাট্যে অধিকতর প্রাণবন্তভাবে আঞ্চলিক ভাষারূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, গ্রামীণ পালাকার-শিল্পীরা যে সকল নাট্যে নিজের জীবনকে প্রতিফলিত করতে আগ্রহী সে সকল নাট্যে প্রতিদিনের মুখের ভাষা প্রয়োগেই তারা মুখর থাকে। উল্লেখ্য, এ ধরনের নাট্যের যেমন লিখিতরূপ থাকে তেমনি অলিখিতরূপে তথা বাচনিক বা মৌখিকরীতিতেও এ প্রকৃতির নাট্য পরিবেশিত হয়ে থাকে, যথা – দিনাজপুর অঞ্চলে প্রচলিত 'পালাটিয়া' বা 'বান্ধানী গানে'র লিখিত পাণ্ডুলিপি প্রত্যক্ষ করা যায়, পক্ষান্তরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী-জয়পুরহাট অঞ্চলে প্রচলিত 'আলকাপ গানে'র আসরে সাধারণত কোনো লিখিত পাণ্ডুলিপি ব্যবহৃত হয় না, টাঙ্গাইল অঞ্চলের 'সঙখেলা' বা 'সঙযাত্রা'র পরিবেশন মূলত বাচনিক বা মৌখিকরীতিতে পরিবেশিত হয়।

বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার তারগাঁও গ্রামের মঙ্গলুচন্দ্র রায় 'বান্ধানী গান'-এর অন্যতম পালাকার, নির্দেশক ও অভিনয়শিল্পী। তিনি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি, তাই হয়ে উঠেছেন স্বশিক্ষিত। 'বান্ধানী গানে'র বিভিন্ন পালা তিনি প্রথমে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে ধারন করেন এবং পরে তা আসরে পরিবেশন করেন। ১৭ এপ্রিল ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুর জেলার তারগাঁও গ্রাম থেকে জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণের মাধ্যমে মঙ্গলুচন্দ্র রায় রচিত 'বান্ধানী গান' বা 'পালাটিয়া'র 'মাটি কাঁপা দেওয়ানি' পালাটি সংগৃহীত হয়। পালাটি দিনাজপুর জেলার আঞ্চলিক ভাষায় রচিত, দৃষ্টান্ত হিসেবে কিছু অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে :

মাটি কাঁপা : সবায় জানে তোগ চিনে চিনিবার বাকি নাই। ও তোর মতন মানুষে নাই।

চিলকো : গটায় ঘুরেক ইউনিয়নটা মানুষের নাগা ঝগড়া- ফকির বইডাগিক ভিক্ষা দিস না।

সুতুরি : আহুকেতু শনি দিষ্টান শয়তানের নাই আরাম ও তোর নাই আল্লা ভগবান।

চিলকো : বিষ খাওয়া ফাঁসি নাগা বাঁচাউ দিন ভগবানটা মানুষ মোলে কথা কহে না।... মোর কি হবে তুই মোলে, দেখিবে সতনীর বেটা তোর অসুখ-বেরাম পালায় না।... মোর বাপ মাও দিছে বিহা ভবিষ্যৎ দেখে নাই মোর জমি বাড়ি আছে তোর।...

ফকির বেশে মাঠি কাঁপার গান :

আল্লা ভগবান দুই ভাই
মুই কহেছু কাহয় নাই
ফকির ফাকরার ভাঙ্গা বাড়ি
দে দিন ওমাক সাহা করি॥[১৫]

এখানে দু'একটি ক্রিয়া ও বিশেষ্য ছাড়া প্রায় অধিকাংশ শব্দ আঞ্চলিক। যে আঞ্চলিক ভাষার ভেতর দিয়ে দিনাজপুর অঞ্চলের সাধারণ গ্রামীণ মানুষের ব্যক্তি জীবনের জীবনচিত্র ও জীবনদর্শন একই সঙ্গে ধৃত হয়েছে।

টাঙ্গাইল জেলার প্রসিদ্ধ নাট্যঐতিহ্য 'সঙযাত্রা' বা 'সঙখেলা'র বিভিন্ন পালাতেও আঞ্চলিক ভাষার এ ধরনের সহজ-সুন্দর রূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার কাওয়ালজানি গ্রামে 'সঙযাত্রা'র মৌখিক আসরে পরিবেশিত 'পিতা-পুত্রের সঙ খেলা' পালা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যায়। যথা :

পুত্র : বাবারে বাবারে... ।

পিতা : এই বাবারে বাবারে করবা না... তোরে খুঁজতি খুঁজতি আমার চোক একেবারে ঘুলা হয়ে গেছে গা...এই কই আছিলি?

পুত্র : কাম-কাজ করতি করতি ভুইলা গিছি গা বাবা... ।

পিতা : কাম-কাজ করতি তুই ভুইলা গিছিস গা!

পুত্র : হ’... এই এই...

পিতা : এই রকম মিছা কতা কস ক্যান... কোন ক্ষ্যাতে কাম করছোস...?

পুত্র : এট্টাও না ।

পিতা : এই দেখেন– কইলাম কাম-কাজ করতি... অহনও এট্টা ক্ষ্যাতেও যায় নাই... এই কোনে আছিলি?

পুত্র : এই না... আমার না... এই না... এই বাবারে... ।

পিতা : কী হয়ছে – ভাইঙ্গা বুললেই না আমি বুঝতি পারি ।

পুত্র : এই না... এই না... বাবারে... ।

পিতা : আরে কী হয়ছে বলবি তো ।

পুত্র : ভালো লাগে নারে বাবা ।

পিতা : আরে ভালো লাগে না ক্যান? ক’ কী হয়ছে– তোর কি সদ্দি-জ্বর হয়ছে?

পুত্র : না, সদ্দি লাগে নাই গা ।

পিতা : তে কী হয়ছে – মাথা বিষ করে?

পুত্র : ভালো লাগে না ।

পিতা : ভালো লাগে না – তাহলি আমি দাঁড়া ডাক্তারখানা থিকে ভিটামিন আইনে দিই...তুই সুস্থ হোবি গা ।

পুত্র : ওতি ভাল হোবি নারে বাবা... ।

পিতা : কী খায়লি তাহলি ভাল হোবি...?

পুত্র : এই না... এই না... বাবা রে... এই না...

পিতা : কি হয়ছে বলবি তো...

পুত্র : এই না... এই না... জানস না বাবা তুই... ।

পিতা : আরে আমি জানলে তে কইতাম-ই... এই কি হইছে...?

পুত্র : বাবারে... । (সাইমন, ২০০৪ : ২৭-২৮)

উদ্ধৃতিতে ‘কইতাম’, ‘কইলাম’, ‘জানস’, ‘ভুইলা গেছিগা’, ‘আইনে দিই’, ‘ওতি’, ‘খায়লি’, ‘জানস না’, ‘হোবি’ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগের ভেতর দিয়ে টাঙ্গাইল অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষের ভাষাভঙ্গির কিছু পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, যদিও উপস্থাপন মুহূর্তে এই আঞ্চলিক ভাষার স্বরূপ গ্রামীণ ও আঞ্চলিক শিল্পীদের মুখে আরও বেশি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ।

উল্লেখ্য, সকল ক্ষেত্রে গ্রামীণ মানুষের পারিবারিক ও সমাজ-জীবন নির্ভর আখ্যান পরিবেশনে আঞ্চলিক ভাষার নিখাদ প্রয়োগ নাও হতে পারে, ক্ষেত্রবিশেষে মিশ্ররীতির ভাষা তথা লোক ও শিষ্ট দুই ধরনের ভাষারীতি মিশ্রণ প্রত্যক্ষ করা যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত আলকাপ-গম্ভীরা নাট্যাঙ্গিক অধিকাংশক্ষেত্রে চাপাইনবাবগঞ্জের লোক বা আঞ্চলিক ভাষারীতিকে আশ্রয় করেই পরিবেশিত হয়ে থাকে। ক্ষেত্রসমীক্ষণ বা জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষার অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করা যায়, আলকাপগানের বিস্তৃতি যখন চাপাইনবাবগঞ্জের গণ্ডি ছাড়িয়ে রাজশাহী অতিক্রম করে নওগাঁ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে তখন তার ভাষারীতিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভাষারীতির পরিবর্তে নওগাঁর স্থানীয় ভাষারীতির সঙ্গে শিষ্টভাষারীতি প্রযুক্ত হয়। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া রাজবাড়ির মাঠে পুঠিয়া থিয়েটার আয়োজিত জাতীয় ঐতিহ্যবাহী নাট্য উৎসবে নওগাঁর আনন্দ মোহন বাগচীর স্বদেশী আলকাপ দলের 'দেবর-ভাবী' পালায় এ ধরনের মিশ্র ভাষারীতির প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা গেছে। (সাইমন, ২০০৬ : ১২৭-১৩৩) আসলে, লৌকিক জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততার প্রতিফলন ঘটে বলে একদিকে যেমন পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নির্ভর নাট্যঐতিহ্য আঞ্চলিক ভাষার গাঁথুনিকে অনুসরণ করে, অন্যদিকে তেমনি সেই নাট্যঐতিহ্য যখন আঞ্চলিক গণ্ডি অতিক্রম করে অন্যত্র গমন করে বা প্রচার মাধ্যমে স্থান করে নেয় তখন তাতে মিশ্র ভাষারীতি গৃহীত হয়।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষা বিচারের সামগ্রিক দিক বিবেচনা করলে যে সকল সিদ্ধান্ত গবেষকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো –

১. সে সকল ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতির সাথে ভক্তিরস যুক্ত তার ভাষা শিষ্ট বামান্য [আদর্শ] রূপ পরিগ্রহ করে, আর তা যদি সনাতন কোনো দেব-দেবী বা লোকপুরাণের চরিত্রদের আশ্রয় করে – তবে তাতে সংস্কৃত প্রণাম, শ্লোক ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়;

২. অনুষঙ্গ হিসেবে ইসলামের শরিয়তি-মারফতি বিষয় যুক্ত হলে তাতে আরবি, ফারসি শব্দের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যায়;

৩. লৌকিক কাহিনি বা লৌকিক জীবন নির্ভর নাট্যঐতিহ্য অনিবার্যভাবে আঞ্চলিক ভাষাকে আশ্রয় করেই দর্শক-শ্রোতাদের সামনে অভিনীত হয়ে থাকে;

৪. যে কোনো আঞ্চলিক ভাষার ঐতিহ্যবাহী-নাট্যই আঞ্চলিক পরিম-লকে অতিক্রম করে অন্যত্র গমন করলে অনেকক্ষেত্রে তাতে ভাষার মিশ্রণ তথা আঞ্চলিকতার সঙ্গে শিষ্ট বা মান্য ভাষার কিছু কিছু প্রভাব গৃহীত হয়, আর এটি ঘটে মূলত পালাকার বা অভিনয়শিল্পী কর্তৃক দর্শক-শ্রোতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্তে;

৫. আসলে, ঐতিহ্যবাহী নাট্যের পরিবেশনে মিশ্ররীতির ভাষার প্রয়োগ ঘটে আরেকটি বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ করে যে কোনো আখ্যান পরিবেশনের সময় গায়ক-পালাকার-

শিল্পীরা শিষ্টভাষার ব্যবহার করলেও যখন মূল আখ্যান পরিবেশনের সমান্তরালে দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য আখ্যান বর্হিভূত যে দৃশ্য সৃজন করেন তখন তারা সেখানে আঞ্চলিক ভাষারীতি প্রয়োগ করে থাকেন। এভাবেও ঐতিহ্যবাহী নাট্যে অনেকক্ষেত্রে ভাষার মিশ্রণ সম্ভব হয়।

এ ধরনের ভাষা বিচারের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষাকাঠামোর নতুন পরিচয়কে শনাক্ত করা যায়, একইসঙ্গে ঐতিহ্যবাহী নাট্যে প্রচলিত ভাষারীতির স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার নতুন সম্ভাবনা অনুভূত হয়।

টীকা

১ আশুতোষ ভট্টাচার্যের *বাংলার লোকসংস্কৃতি* শীর্ষক গ্রন্থে 'লোকনাট্য' সম্পর্কে বলা হয়েছে:

ক. 'লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনির উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক।'

খ. 'নিরক্ষর গ্রাম্য এই সব নাটকের পালা রচয়িতারা সারা বছর ধরে গ্রামের সামাজিক এবং পারিবারিক নানা ঘটনার উপর লক্ষ্য রাখে... মুখে মুখে নাটক রচনা করে এবং তার অভিনয় করে। সমস্ত ঘটনাটির ধারাবাহিকতা রক্ষা করে গান রচিত হয় এবং তাতে আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের সুরারোপ করা হয়। মধ্যে মধ্যে তাৎক্ষণাৎ মুখে মুখে রচিত আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ ব্যবহার করা হয়।'

গ. '... মধ্যে মধ্যে আঞ্চলিক উপভাষায় তাৎক্ষণিক মুখে মুখে রচিত গদ্য-সংলাপও ব্যবহার করা হয়।'

অন্যদিকে মাধুরী সরকারের "লোকনাট্য" শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে:

ঘ. '... যদিও তা আঞ্চলিকতার পরিচয় বহন করে। এর ভাষায়, সংলাপে আঞ্চলিক উপভাষা বিদ্যমান। জীবনযাত্রার আঞ্চলিক রীতি-নীতির ছাপ লোকনাট্যে আছে। এগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, আছে ঐক্যের সূত্রও। লোকনাট্য মূলত লোকসমাজের আত্মিক ও বৈষয়িক জীবনের দর্পণ।'

২ ক. 'পৃথিবীর সব দেশেই লিখিত সাহিত্য বা সংস্কৃতিধারার সঙ্গে অলিখিত বা মৌখিক একটি ধারাও সমান্তরালভাবে চলে এসেছে। এই অলিখিত কলার মধ্যে প্রাচীন শিল্প, অনুষ্ঠান উৎসব সমাজে সংহতির আসল রূপ। বাংলার লোকনাট্যের আলোচনা এগুলির বিচার জরুরী।' [দুলাল চৌধুরী, "লোকনাট্য"]

খ. 'লোকনাট্য প্রধানত অলিখিত (এখন লেখার প্রচলন হয়েছে)।... লেখনীর শাসন না থাকলেও লোকনাট্যের গান, সংলাপ শৃঙ্খলাবিহীন যথেষ্ট নয়। অলিখিত, অভিজ্ঞতাজাত একটা শৃঙ্খলা লোকনাট্যে ধরা থাকে।' [মাধুরী সরকার, "লোকনাট্য"]

৩ অষ্টকগান বা অষ্টকপালার অভিনয় উপস্থাপন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা আসরে যে বাড়ির উঠানে হোক বা অস্থায়ী-স্থায়ী মঞ্চে হোক লিখিত পাণ্ডুলিপি

দর্শক-শ্রোতাদের সামনে নির্দেশক অভিনয়শিল্পীদের পাশে থেকে ব্যবহার করেন। এছাড়া, নাট্যরীতি যাত্রাগান, ঢপযাত্রা, গাজীর যাত্রা, কৃষ্ণলীলা, এমনকি হাজং, চাকমা ইত্যাদি নৃগোষ্ঠীদের বিচিত্র ধরনের নাট্য পরিবেশনে পালার নির্দেশক বা প্রম্পটার কর্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপি ব্যবহৃত হয়।

[৪] ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষণে মিহির ঘোষ, অমল ব্যানার্জী, দুলাল চক্রবর্তী, অনিতা রাণী দেবনাথ, এমনকি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শ্যামলী দাসীকে ঢাকার বিভিন্ন মন্দির, সাভারের পালপাড়া মন্দির, টাঙ্গাইলের পাকুল্লার রাধাকালাচাঁদ মন্দির প্রভৃতি স্থানে লীলানাট্য পরিবেশন করতে দেখেছি। টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার পাকুল্লা গ্রামে রাধা-কালাচাঁদ মন্দির সংলগ্ন নাটমণ্ডপে ৮ মে ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার বাল্লোপাড়া গ্রামের বিখ্যাত কীর্তনীয়া মিহির ঘোষ ও তাঁর দলের পদাবলি কীর্তন *গোষ্ঠলীলা*'র পরিবেশন প্রত্যক্ষণ এবং আসর শেষে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কীর্তনীয়ার নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অবলম্বনে।

[৫] ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষণে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার গাড়াপোতা গ্রামে সুকান্ত স্মরণী ক্লাব আয়োজিত ৪০তম অষ্টক মেলাতে যোগ দিয়ে এ ধরনের তথ্য ও প্রামাণ্য সংগ্রহ করেছি। নড়াইলের বিপিন বিহারি ও মাগুরার বীরেন্দ্রনাথ রায় লিখিত পাণ্ডুলিপি সেখানকার অষ্টকগানের আসরে ব্যবহৃত হয়।

[৬] ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শ্যামলী দাসী প্রতি বছর বিভিন্ন বাংলাদেশে 'পদাবলি কীর্তন' পরিবেশন করে থাকেন।

[৭] বাক্যে ব্যবহৃত 'মান্য বা আদর্শভাষা' কথাটি পবিত্র সরকার প্রণীত *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*শীর্ষক গ্রন্থধৃত "লোকভাষা ও লৌকিক ভাষাতত্ত্ব" শিরোনামের প্রবন্ধ থেকে গৃহীত হয়েছে।

[৮] বাচনিক বা মৌখিকরীতির নাট্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে সরাসরি আসর থেকে শব্দধারণযন্ত্রে ধারনকৃত পালার শ্রুতি লিখনকে 'বাচনিক বা মৌখিকরীতির পাণ্ডুলিপি' হিসেবে বোঝানো হয়েছে। হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি যা সরাসরি আসরে ব্যবহৃত হয়, তার অনুলিপি অবলম্বনে আলোচনা করা হয়েছে।

[৯] লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী থানার স্বর্ণামতি মন্দিরে শিবরাত্রি উপলক্ষে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে কুড়িগ্রামের পালাকার-শিল্পী কৃপাসিন্ধু রায় সরকার কর্তৃক পরিবেশিত 'রামলীলা'র 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' পালার অডিও-রেকর্ডারে ধারণকৃত অংশের শ্রুতিলিখন।

[১০] পবিত্র সরকার "লোকভাষা ও লৌকিক ভাষাতত্ত্বে"র আলোচনা করতে বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যেও এ ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি লিখেছেন– "তৎসম শব্দের সংখ্যাল্পতা, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দাবলির আধিক্য; ইংরেজি শব্দের মৌখিক রূপান্তর – টেন (train), টাইম (time), ডেরাইভার (driver), এস্‌টাইক (strike) ইত্যাদি।" (সরকার, ১৯৯০ : ১৫৫)

[১১] নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর থানার বগাভিড়া গ্রামের রাধাকৃষ্ণ সম্প্রদায় পরিবেশিত 'মহিষাসুরবধ' পালার ধারণকৃত শ্রুতিলিখন।

[১২] প্রাগুক্ত

[১৩] মানিকগঞ্জ জেলার চরখণ্ড গোলরা গ্রামে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে পরিবেশিত 'শহীদে কারবালা' শীর্ষক ইমামযাত্রার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত।

[১৪] মানিকগঞ্জ জেলার চরখণ্ড গোলরা গ্রামে পরিবেশিত 'শহীদে কারবালা' শীর্ষক ইমামযাত্রার পাণ্ডুলিপি রচয়িতা নূর মোহাম্মদ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বলেছেন – তিনি পাণ্ডুলিপিটি মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' অবলম্বনে রচনা করেছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ, স্থান : চরখণ্ড গোলরা, চাঁনমিয়া পির সাহেবের গৃহপ্রাঙ্গণ।

[১৫] দিনাজপুর জেলার কাহারোল থানার তারগাঁও গ্রামে ১৭ এপ্রিল ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে পরিবেশিত 'বান্ধানী গানে'র ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত মঙ্গলুচন্দ্র রায় লিখিত 'মাটি কাঁপা দেওয়ানিয়া' পালা থেকে উদ্ধৃত।

প্রসঙ্গক্রমে ঐতিহ্যবাহী নাট্যে লিখিত পাণ্ডুলিপি ও তার ভাষারীতির ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে উত্তরবঙ্গের দুই ধরনের নাট্যপালা ও পালাকার সম্পর্কে কিছু তথ্য উল্লেখ করা যায়, যার একটি হল– 'বান্ধানী গানে'র (যা শিক্ষিত সমাজে 'পালাটিয়া' নামে অধিক পরিচিত) আঙ্গিকে পরিবেশিত 'মাটি কাঁপা দেওয়ানি' পালা এবং অন্যটি হল– 'রামযাত্রা'র আঙ্গিকে পরিবেশিত 'রাম লক্ষ্মণ ও সীতার বনবাস' পালা। এই দুটি নাট্যাঙ্গিকে পরিবেশিত পালারই লিখিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে। কিন্তু একটি পাণ্ডুলিপি (রামযাত্রার আসরে) সরাসরি ব্যবহৃত হয়েছে প্রম্পটার কর্তৃক আর অন্য পাণ্ডুলিপিটি (বান্ধানী গানের আসরে) ব্যবহৃত হয়েছে গ্রিনরুম থেকে অভিনয়শিল্পীর আগমন-নির্গমনের নির্দেশনা হিসেবে। অবশ্য দুটি অভিনয়রীতির পাণ্ডুলিপির আলাদা আলাদাভাবে একক রচয়িতা রয়েছেন– এক্ষেত্রে অনেকের মনে প্রশ্নের উদয় হতে পারে এতে ঐতিহ্যবাহী নাট্যের সামষ্টিক পরিচয় হারিয়ে যায় কি-না? সে প্রশ্নের উত্তরে পালাকার-গায়কগণ জানান যে, পালাকারগণ প্রথমে এককভাবে কাহিনির কাঠামোটা দাঁড় করান, তারপর তা নিয়ে দলের অন্যান্য শিল্প-কুশীলবদের সঙ্গে বসে পালাটি আবার নতুনভাবে বিন্যাস ও পুনঃরচনা করেন। গত ১৭ এপ্রিল ২০১০ তারিখে দিনাজপুর জেলার কাহারোল থানার অন্তর্ভূক্ত তারগাঁও-উপরপরি গ্রামে বসে বান্ধানী গান (পালাটিয়া)-র 'মাটি কাঁপা দেওয়ানি'পালার পালাকার মঙ্গলুচন্দ্র রায় (৫৪) তার নিজের পালা রচনা সম্পর্কে এমনটাই জানিয়েছেন। তিনি একজন স্বশিক্ষিত পালাকার, নিজে কখনো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেন নি, অর্থাৎ কোনো স্কুলে বা নাইটস্কুলেও যান নি, তারপরও নিজের চেষ্টায় তিনি পড়তে ও লিখতে পারেন। নিজের সাদা খাতায় তিনি অঙ্কনশিল্পীর স্কেচের মতো প্রথমে পালার খসড়া তৈরি করেন এবং তা পড়ে শোনান তার বান্ধানী গানের দলের অভিজ্ঞ শিল্পীদের। এরপর তিনি বান্ধানী গানের শিল্পীদের মতামতের ভিত্তিতে পালাটিকে আসরের উপযোগী করে তোলেন। তবে তো ঐতিহ্যবাহী নাট্যের এই পাণ্ডুলিপি রচনা এবং তা আসরে উপস্থাপনের এই প্রক্রিয়াটি শেষ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবেই সমাজের একটি সামষ্টিক সৃজনশীল ফসলই হয়ে ওঠে।

গ্রন্থপঞ্জি

আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৮২)। *বাংলার লোকসংস্কৃতি*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়া দিল্লি

দীনেশচন্দ্র সেন (১৯৯৩)। *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

দীনেশচন্দ্র সেন (১৯৩০)। *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা*, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

পবিত্র সরকার (১৯৯৭)। *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*, চিরায়ত প্রকাশন, কলিকাতা

সাইমন জাকারিয়া (২০০৪)। *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, প্রথম পর্ব, উত্তরণ, ঢাকা

সাইমন জাকারিয়া (২০০৬)। *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, দ্বিতীয় পর্ব, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

সাইমন জাকারিয়া (২০০৭)। *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, তৃতীয় পর্ব, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

সাইমন জাকারিয়া (২০০৮)। *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, চতুর্থ পর্ব; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

সাইমন জ়াকারিয়া ও নাজমীন মর্তুজা (২০১২)। *ফোকলোর ও লিখিত সাহিত্য : জারিগানের আসরে 'বিষাদ-সিন্ধু' আত্তীকরণ ও পরিবেশন-পদ্ধতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

প্রবন্ধ

অদ্বৈত মল্লবর্মণ (২০১১)। *বিনোদের পালা*, রচনাসমগ্র [সম্পা. অচিন্ত্য বিশ্বাস] দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পৃ. ৭৮-৮১

দুলাল চৌধুরী (২০১৩)। *লোকনাট্য*, *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ* [সম্পা. দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত] পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, পৃ. ২১২-২১৩

মাধুরী সরকার (২০১৩)। *লোকনাট্য*, *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ* [সম্পা. দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত] পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, পৃ. ২১০-২১২